রাদুগা

ল্যুবোভ ভরোঙ্কভা

যাদু তীর

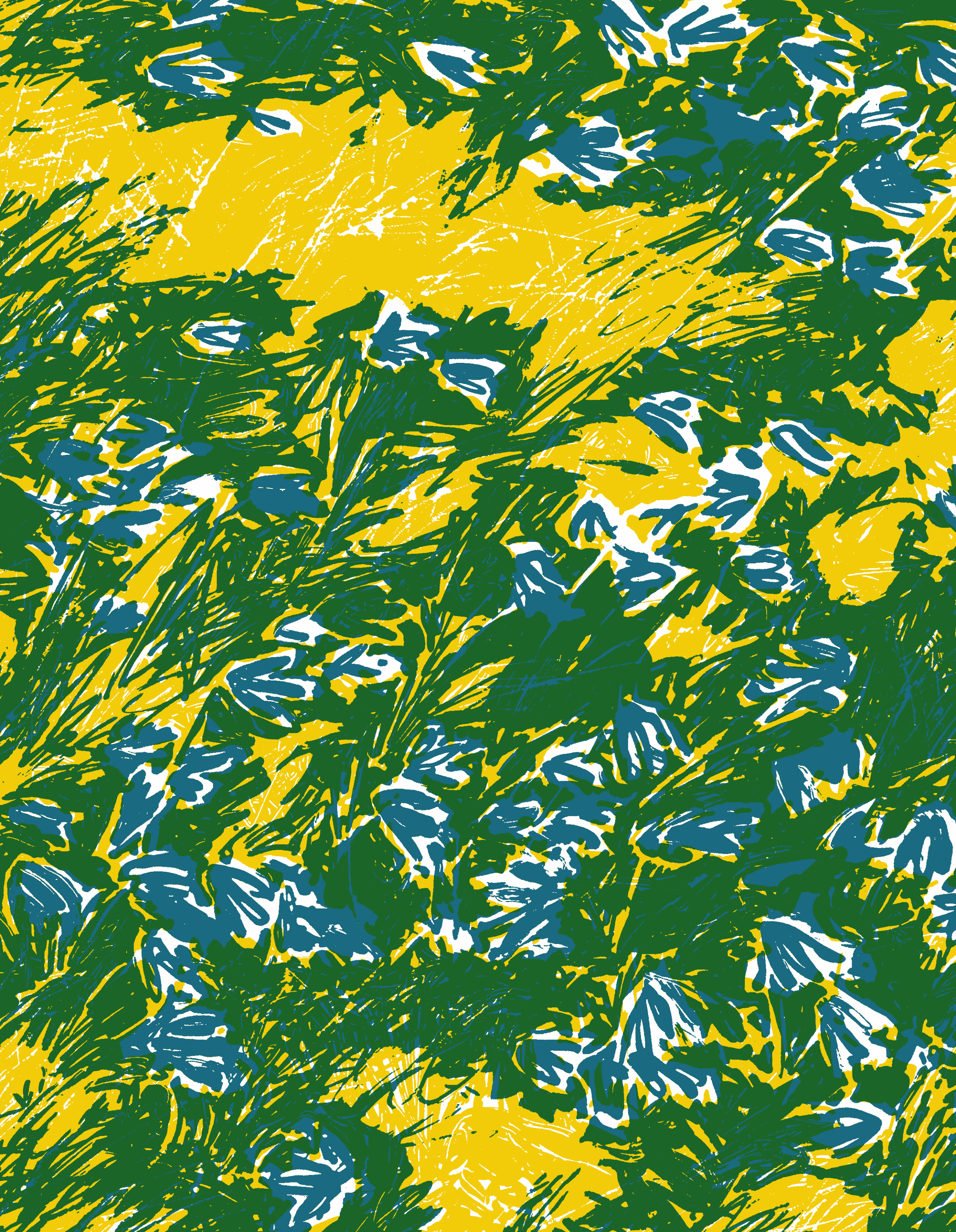

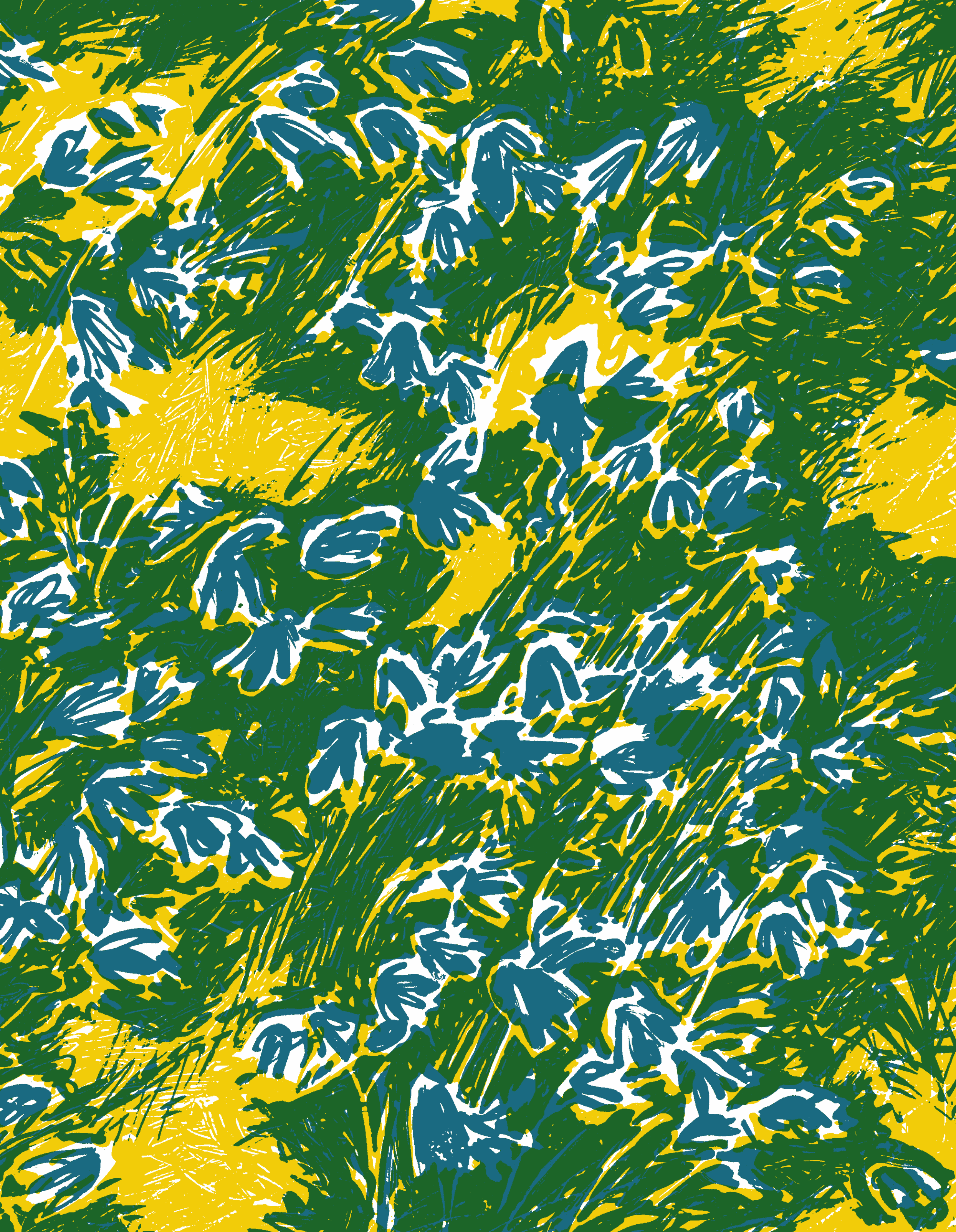

ল্যুবোভ ভরোঙ্কভা

যাদু তীর

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অন‌ুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ভ. আলেক্সেয়েভ

Л. ВОРОНКОВА
ВОЛШЕБНЫЙ БЕРЕГ
На языке бенгали

সূচী

যাদু তীর 7
শহরের মেয়ে 47

আমার আদরের ছোটো পাঠকেরা!

সুদূর মস্কো থেকে এই বইটি এসেছে তোমাদের জন্যে। তাতে আছে 'শহরের মেয়ে' আর 'যাদু তীর' নামে দুটি ছোটো উপন্যাস।

'শহরের মেয়ে' আমি লিখেছিলাম দেশের ঘোর দুর্দিনে। যুদ্ধ তখন। আমাদের শহর নগরে বোমা ফেলছিল ফাশিস্টরা, রোজ রাতে চারিদিকেই অগ্নিকাণ্ডের ঝলক, মাথার ওপর কালো স্বস্তিকা আঁকা শত্রু বিমানের গর্জন।

তখন আমি গাঁয়ে চলে আসি, নিজেদের বাড়িতে। ছারখার শহর থেকে উদ্বাস্তুরা যেত রাস্তা দিয়ে। ছোটো ছেলেমেয়েরাও ছিল সে মিছিলে, অনেকে তাদের অনাথ, মা-বাপ নেই। আর যে সব গাঁয়ের পাশ দিয়ে তারা যেত, সেখানকার লোকেরা তাদের পুষ্যি নিত নিজেদের সংসারে।

যৌথখামারীর সংসারে পুষ্যি নেওয়া অমনি একটি মেয়ের কথাই লিখেছি বইটিতে।

সোজাসুজি বলা যেত: ভাল্যা মেয়েটি নতুন মা-বাপ পেল, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটতে লাগল। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, অত চট করে কি আর সব ভালো হয়ে যায়? অত সহজে কি ভোলা যায় নিজের বাপ, নিজের মাকে, অন্যকে ডাকা যায় মা বলে?

না, অত সহজ ব্যাপারটা নয়। এটা ঘটা সম্ভব কেবল অগাধ ভালোবাসায়, বুক ভরা মায়ায়। সাধারণ যে যৌথচাষী মা পুষ্যি নিয়েছিল ভালেন্তিঙকাকে সে কিন্তু এই অলৌকিক কাণ্ডটাই ঘটাতে পেরেছিল।

বইটিতে আমি মস্কোর কাছাকাছি একটা গাঁয়ের ছবি এঁকেছি। আমাদের গ্রাম আমি ভালোই চিনি, কেননা আমার মা-বাপেও যৌথচাষী। নিজেই আমি কৈশোরে গাঁয়ে ছিলাম, ক্ষেতে কাজ করেছি, ফসল তুলেছি, বিচালি বানিয়েছি, শণ পিটিয়েছি...

তাই আমার বইগুলিও প্রায় সবই গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে, যে প্রকৃতির মধ্যে তারা বেড়ে ওঠে সেই নদী আর বন, কঠিন আর আনন্দময় যত গাঁয়ের কাজ, গাঁয়ের স্কুল নিয়ে...

এ রকম বই আমার আছে অনেক, যেমন, তানিয়া আর আলেঙকা নামে দুই সখিকে নিয়ে পাঁচটি উপন্যাস 'রোদ্দুরের দিন', যুদ্ধে ছারখার হওয়া একটা যৌথখামারকে ছেলেমেয়েরা কী ভাবে ফের দাঁড় করতে সাহায্য করল সেই কাহিনী নিয়ে 'গরাদিশ্যে গ্রাম', অটল বন্ধুত্বের গল্প 'ফেদিয়া আর দানিলকা', উদ্দাম কাতুনা নদীর তীরে পার্বত্য আলতাইয়ের স্কুল ছাত্রদের নিয়ে 'আলতাই কাহিনী'...

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার বরাবরই খুব ভাব। আর সবাই জানে, বাচ্চারা রূপকথার খুব ভক্ত, হয়ত তোমরাও। আমিও রূপকথা পড়েছি অনেক, ছোটোদের কাছে তা গল্প করে শুনিয়েছি। তারপর নিজেই একটা রূপকথা লিখে ফেললাম: 'যাদু তীর'। ওটা পড়বার সময় ভেবে নিও যে আমি তোমাদের কাছেই বসে তোমাদের গল্প বলছি।

এখনো আমার সব বই আমি লিখে ফেলি নি। বর্তমানে লিখছি স্কুল-পড়ুয়াদের জন্যে, তোমাদের দাদা দিদিদের জন্যে উপন্যাস। ঘটনাটা অতীত ইতিহাস নিয়ে, তাতে আছে প্রাচীন পারস্যের রাজা কির, মেসিয়া যুদ্ধ, দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার, যিনি তোমাদের দেশেও গিয়েছিলেন। হয়ত বইটা একদিন তোমাদের হাতেও পেঁাছবে, কেননা বই তো কখনো দূরে যেতে ভয় পায় না। সর্বত্রই পাঠক খুঁজে বেড়ায় তারা, তোমাদের কাছেও হাজির হবে আন্তরিক মৈত্রীর অকপট দূত হিশেবে।

ল. ভরোঙকভা

প্রকাশকের নিবেদন

আদরের কিশোর বন্ধুরা!

বাঙলা ভাষায় 'রামধনু' সিরিজে কিশোর পাঠকদের জন্য এবার এই বইটি নিয়ে হাজির হচ্ছে প্রগতি প্রকাশন।

এ সিরিজে আগেই বেরিয়েছে:

সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা জাতির লেখকদের গল্পসংকলন 'বৃষ্টি আর নক্ষত্র'। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কথা: 'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা'। আনাতোলি আলেক্সিনের অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'ভয়ংকর রোমহর্ষক ঘটনা'।

প্রকাশিত হচ্ছে: প্রথম ব্যোমনাবিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, ইউরি গাগারিনের লেখা: 'পৃথিবী দেখছি', অনেক প্রামাণিক ফোটোগ্রাফ থাকবে তাতে। চিরায়ত রুশ সাহিত্যিক আন্তন চেখভের 'কাশতানকা'।

বইগুলি কেমন লাগল সেটা তোমাদের আর তোমাদের গুরুজনদের কাছ থেকে জানতে পেলে আমরা খুবই খুশি হব। আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

যাদু তীর

শুরু

ফেন্যা বললে:

'আজ রাতে সায়রে আমার একা থাকতে ভয় করবে। কাত্যার ঠাণ্ডা লেগেছে, আসতে পারবে না।'

মা বললে:

'লিওন্যাকে সঙ্গে নে, হাজার হোক দু'জন তো।'

লিওন্যা ছুরি দিয়ে কাঠ চাঁচছিল। ভেবেছিল রকেট বানিয়ে চাঁদে উড়ে যাবে। কিন্তু সায়রে যাবার দরকার থাকলে তাতেও সে রাজী।

মা বললে একটা মোটা পোষাক সঙ্গে নিতে। সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা পড়বে। ফেন্যাকে দিলে খাবারের একটা ঝুড়ি।

'দু'জনের মতো খাবার দিও কিন্তু,' বললে লিওন্যা, 'নইলে কুলবে না!'

'তিন জনের কুলিয়ে যাবে,' বললে মা, 'তবে হাঁ করে বসে থাকিস না, হাঁসগুলোর দেখাশোনা করবি ভালো করে।'

'ঠিক আছে, হাঁ করে থাকব না,' বললে লিওন্যা।

দিদির আগেই রাস্তায় ছুটল সে। সায়রটা কোথায় তা সে জানে।

হাঁসেরা কী বললে

সায়রে এসে ফেন্যা আর লিওন্যা নৌকোয় করে চলে এল অপর পারে। সেখানে তীরের বালিতে গিজগিজ করছে শাদা শাদা হাঁস।

এত শাদা যেন দুধে নেয়ে উঠেছে।

'শ'খানেক হবে,' বললে লিওন্যা, 'দাঁড়াও, গুণছি।'

'গুণে লাভ নেই। একশ নয়, একশ গুণ একশ, গুণে উঠতে পারবি না,' বললে ফেন্যা।

হাঁসেদের খাবার তৈরি করতে গোলাঘরে গেল ফেন্যা, আর তীরে বসে হাঁস দেখতে লাগল লিওন্যা।

হাঁসেরা ওর দিকে নজর দিলে না। গরম বালিতে ঝিমুচ্ছে কেউ, হালকা ঢেউয়ে কেউ ভাসছে, কেউ বা আবার জলে মুখ ডুবিয়ে কিছু ধরছে। আর অনবরত প্যাঁকপ্যাঁক করছে, কথা কইছে নিজেদের মধ্যে।

'ভারি একঘেয়ে!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে লিওন্যা, 'কী করা যায় এখানে, চান করে নেব?'

এই সময় একটা হাঁস জলের কাছে ছুটে এসে চ্যাঁচালে:

'বেশি দূর যাস নে, বেশি দূর যাস নে, বিপদ হবে!'

'কেন, কীসের বিপদ?' সশঙ্কে হাঁসগুলো এসে ঘিরে ধরল ওকে।

জলের দিকে চেয়ে হাঁসটা আস্তে করে বললে:

'শুনলাম ভোঁদড় এসেছে সায়রে!'

'কোথায় ভোঁদড়?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা।

হাঁসটা আবার তাকালে সায়রের দিকে:

'শুনছি নাকি চরটার কাছে।'

'বটে!' বললে লিওন্যা, 'না, ঝিমুবার সময় নেই।'

ছুটে গেল সে নৌকাটার কাছে, ঠেলা দিয়ে নামাল জলে।

গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এল ফেন্যা।

'চললি কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'ভোঁদড় এসেছে সায়রে,' বললে লিওন্যা, 'চরে যাচ্ছি ভোঁদড় খুঁজতে।'

'কোত্থেকে শুনলি?'

'হাঁসগুলো বললে যে।'

'ফাজলামি রাখ! ভোঁদড় ফোঁদড় কিছু নেই এখানে। আর দেখিস, নৌকো সামলে। উল্টে গিয়ে ডুবে মরবি!'

দাঁড় নিয়ে লিওন্যা চরে গেল ভোঁদড় খুঁজতে। হালকা নৌকো, আপনা থেকেই ভেসে গেল তরতরিয়ে।

কোন এক সোহাগীর সঙ্গে দেখা

চরটা ভারি ছোটো, কিন্তু গাছপালায় একেবারে ঠাসা, যেন দুনিয়ায় এর চেয়ে ভালো ঠাঁই তারা আর পায় নি।

নৌকো বেঁধে তীরে উঠতে যাবে লিওন্যা, হঠাৎ গুনগুন করে উঠল হোগলারা, খসখস করে উঠল ঝোপ:

'যেতে দিও না ওকে, যেতে দিও না।'

হোগলাগুলো তীর জুড়ে শুয়ে পড়ে আড়াল করে রইল পথ, ঝোপগুলো ডালপালা ছড়িয়ে যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়াল।

আর মাথা দুলিয়ে রইল গাছগুলো, চর হয়ে উঠল অন্ধকার।

'আমার পথ আটকাচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা।

'তুই এসে ধুনি জ্বালাবি,' খসখস করে উঠল ঝোপঝাড়, 'অগ্নিকাণ্ড ঘটাবি! ছেলেপিলেরা কেবলি তাই করে!'

'মোটেই না,' বললে লিওন্যা, 'আমার কাছে দেশালাই পর্যন্ত নেই!'

'তাহলে তুই ছিপ বানাবার জন্যে কচি গাছগুলোকে কাটবি,' শনশন করে উঠল গাছগুলো, 'কত কষ্ট করে আমরা আমাদের ডালপালা বাড়াচ্ছি, ফুল পাতা ফোটাচ্ছি, আর এই সব ছেলেরা এসে আমাদের ছারখার করছে!'

'মোটেই না,' বললে লিওন্যা, 'আমার কাছে ছুরি পর্যন্ত নেই!'

'তাহলে এলি কেন?' সড়সড় করে উঠল হোগলাবন, 'ঝোপঝাড়ে পাখির বাসা খুঁজবি বুঝি?'

'পাখির বাসা খোঁজার জন্যেও আসি নি আমি,' বললে লিওন্যা, 'এসেছি ভোঁদড় ধরতে। এখানে এই চরেই আছে সে। ভয় পাচ্ছে হাঁসগুলো। পাবেই তো। ঠ্যাং কামড়ে জলের তলে টেনে নিয়ে যাবে যে!'

'বটে-এ-এ!' একসঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল হোগলা, ঝোপঝাড় আর গাছগুলো, 'তাহলে আয়।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল হোগলারা, ডালপালা উঠিয়ে নিলে ঝোপগুলো, মাথা তুললে গাছেরা, আলো হয়ে উঠল চরটা।

'শুধু ভোঁদড়টা দেখতে কেমন তা জানি না,' বললে লিওন্যা, 'জীবনে কখনো তো ভোঁদড় দেখি নি। তোমরা হয়ত জানো, বলো না আমায়?'

'উঁহু, আমরাও কখনো দেখি নি, বলতে পারব না...' কলরব করে উঠল সবাই, 'খরগোস চিনি, শেয়াল চিনি, কিন্তু ভোঁদড় কখনো দেখি নি!'

'ঠিক আছে,' বললে লিওন্যা, 'দেখলেই চিনতে পারব,' এই বলে ঢুকলে বনের ভেতর।

দশ পা-ও লিওন্যা যায় নি, দেখে ভারি মিষ্টি কী একটা জন্তু। বসেছিল একটা পুরনো গুঁড়ির ওপর, গায়ে কালচে বাদামী লোম, ফুঁয়ো ফুঁয়ো লেজটা পড়ে আছে পায়ের কাছে, জ্বলজ্বল করছে ছোটো ছোটো চোখদুটো।

জন্তুটা বললে:

'নমস্কার লিওন্যা, আমার চরটা তোর কেমন লাগছে?'

'ভারি ভালো লাগছে,' বললে লিওন্যা, 'কিন্তু আমার নাম তুই জানলি কী করে?'

'তোর দিদি তোকে যখন ডাকছিল, তখন শুনেছি।'

'তাহলে, এটা তোর চর?'

'হ্যাঁ, আমার চর।'

'এইখেনে তোর জন্ম?'

'ন-না, জন্ম হয় নি। স্রেফ এখানে চলে আসি, তারপর থেকে গেছি। চরটাও হয়ে গেছে আমার চর।'

'নাম তোর কী?'

'ড়দভোঁ।'

'কী, কী বললি? ড়দভোঁ?'

'হ্যাঁ। তাতে অবাক হবার কী আছে? নামটা পছন্দ হল না?'

অমন নাম যে তার সত্যিই পছন্দ নয়, লজ্জায় সেটা লিওন্যা বলতে পারল না।

'তা তো বটেই। কত রকমই তো নাম হয়। কিন্তু এ নামটা তোকে কে দিলে?'

'আমি নিজেই দিয়েছি। তুই কী ভেবেছিস, আমরা জন্তুরা ভালো নাম বানাতে পারি না? আর লোকে আমায় কী বলে সেটা যদি তুই জানতিস। থু-থু! ভাবতেও ঘেন্না হয়।'

'এখানে থাকিস কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা, 'বনে তুই খাস কী?'

'নিজের গর্তে থাকি, ভদ্দরলোক সব জন্তু যেমন থাকে। আর কী খাই? হি-হি-হি, খাই বুনো বৈঁচি। বৈঁচি খেতে তোর ভালো লাগে?'

'কার না লাগে?'

গুঁড়ি থেকে লাফিয়ে নামল জন্তুটা।

'তাহলে তোকে আমার বৈঁচিতলাটা দেখাই চল! বৈঁচিতে বৈঁচিতে একেবারে লাল হয়ে আছে। যাবি?'

'উঁহু,' বললে লিওন্যা, 'এখন আমার সময় নেই। ভোঁদড় খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

লিওন্যার চোখের দিকে ভালো করে তাকাল জন্তুটা:

'কেন খুঁজছিস বল তো?'

'কেন মানে? ওটা যে ভারি পাজী জানোয়ার। পুকুরের মাছ ধরে খায়, নষ্ট করে পাখির বাসা। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, হাঁসের পা কামড়ে ধরে জলের তলে টেনে নিয়ে যায়। তুই-ও সাবধান থাকবি। টেনে নিয়ে যাবে জলে। নিশ্চয় সাঁতরাতে পারিস না?'

'উঁহু, একেবারে পারি না, একেবারে না। জলকে আমি যমের মতো ভয় করি।'

এই বলে লিওন্যার সোহাগ কাড়তে লাগল জন্তুটা, নিজের নরম গা দিয়ে লিওন্যার পা ঘষতে লাগল।

'ভাগ্যিস বললি। আচ্ছা, জন্তুটাকে পেলে কী করবি?'

'শিকারীদের জানিয়ে দেব, তারা এসে মারবে। আমায় শুধু জানতে হবে কোথায় ওটা থাকে।'

'তাহলে তোকে আমি মদত দেব লিওন্যা, যেই ভোঁদড় আসবে অমনি আমি শিস দেব। এই ভাবে...' বলে পাখির মতো নরম শিস দিলে জন্তুটা, 'তাই ভাবনা নেই, নিশ্চিন্তে গিয়ে ঘুমো। আমার শিস যতক্ষণ না শুনছিস, ততক্ষণ কোনো বিপদ নেই। আমি তোর চৌকিদারের কাজ করব আর কি। দ্যাখো দিকি! মাছ খেয়ে বেড়ায়, হাঁসের পা ধরে টানে! কী রকম পাজী দেখেছ? ওকে এখন আর খুঁজে লাভ নেই। জলে ডুব দিয়ে বসে আছে তলায়।'

'আর তুই জলে ডুব দিতে পারিস?'

'আমি?' নিজের নরম লোম আর লম্বা লেজের দিকে তাকাল জন্তুটা, 'হি-হি-হি! জলে আমার থাবা ভেজাতেও ভয় লাগে।'

'যাই বলিস ড়বভোঁ, থাবা তোর কিন্তু ভেজা ছিল,' বললে লিওন্যা, 'এই দ্যাখ, গুঁড়িতে দাগ রয়ে গেছে।'

'প্রথমত, আমার নাম ড়বভোঁ নয়, ড়দভোঁ। আর দ্বিতীয় কথা, হঠাৎ একটা জলজমা জায়গায় পা পড়ে গিয়েছিল যে।'

শিস দিয়ে জন্তুটা জঙ্গলে ঢুকে গেল।

'তাহলে শিস দেব, কান পেতে থাকিস।'

'ঠিক আছে,' বললে লিওন্যা।

নৌকায় চেপে সে ফিরে এল নিজেদের তীরে।

'কী, ভোঁদড় পেলি?' জিজ্ঞেস করলে ফেন্যা।

'উঁহু,' বললে লিওন্যা, 'ভোঁদড় দেখলাম না, তবে ড়দভোঁ নামে একটা জন্তুর সঙ্গে দেখা হল। ওহ, কী বুদ্ধিমান। ও আমাদের চৌকিদারের কাজ করবে আর কি। ভোঁদড় দেখলেই ওখান থেকে সে আমাদের শিস দেবে। এখন আর হাঁসেদের কোনো ভয় নেই।'

'কী নাম বললি ওর?'

'ড়দভোঁ।'

'ঈস, যত তোর সৃষ্টিছাড়া খেয়াল,' বললে ফেন্যা, 'কবে একটু মানুষ হবি বল তো? দুনিয়ায় ও নামের কোনো জন্তুই নেই। নে, আয় আমার সঙ্গে একটু হাত লাগা। তাজা খড় বিছিয়ে দিতে হবে হাঁসেদের জন্যে, নইলে রাগ করবে ওরা।'

মহাকাশ যাত্রা

চালার তলে খড় বয়ে আনতে হাত লাগালে লিওন্যা। হালকা খড়, শুকনো খড়খড়ে, রোদে ঝকমক করছে। সুড়সুড়ি লাগছিল গলায়, হাত ছড়ে যাচ্ছিল, তাহলেও হাঁসেদের বিছানাটি হল চমৎকার, ফুলো-ফুলো, নরম। নিশ্চয় লিওন্যাকে এবার ধন্যবাদ জানাবে হাঁসেরা। স্যাঁতসেঁতে বিছানায় শুতে ওদের যে একটু ভালো লাগে না। নোংরা ভেজা বিছানায় অসুখ হতে পারে। এমন কি মারাও যেতে পারে। কী নরম গা ওদের!

হলদে খড়ে যেন আলো হয়ে উঠল চালার তলটা, যেন রোদ্দুর জড়িয়ে গেছে খড়গুলোয়। গড়িয়ে নেবার জন্য সেখানে হাঁসগুলো আসার আগে লিওন্যা নিজেই তাদের বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এই সময় খামারে এল ছোট্ট মেয়ে আরিঙ্কা। বাপ তার ফেন্যা সমেত রাষ্ট্রীয় খামারের একদল লোকের কাজ দেখাশোনা করে, ব্রিগেডিয়ার সে।

ফেন্যাকে সে বললে:

'বাবা আমায় পাঠালে, বললে, একা তুমি এখানে কী করে সামলাবে? তোমায় সাহায্য করা দরকার?'

ফেন্যা হাসল। বললে:

'না আরিঙ্কা, সাহায্য আমার দরকার নেই। সাহায্য করার লোক আমার আছে।'

'কে সে?'

'আমি!' চেঁচিয়ে বললে লিওন্যা।

'ভালো সাহায্যের লোকই বটে। একেবারে খড় মাথা,' বললে আরিঙকা, 'মাথা ভর্তি খড়।'

'তাতে কী,' বললে লিওন্যা, 'হাঁসের বিছানা করছিলাম যে।'

আরিঙকা তাকিয়ে দেখল। গোটা তীর জুড়ে হাঁস। সায়রের জলে রোদ ঝিকমিক করছে। চমৎকার!

'আমিও তোমায় সাহায্য করব ফেন্যা,' বললে আরিঙকা, 'তোমার সঙ্গে আমিও হাঁসদের খাওয়াব।'

ফেন্যা বললে:

'বেশ তো, ভালোই হবে। দরকার পড়লে তোকে ডাকব। এখন খেল গে।'

'কী খেলব?' জিজ্ঞেস করলে আরিঙকা।

'আমি খেলব না,' বললে লিওন্যা, 'আমি তো আর এখন বাচ্চা নই। তবে যদি চাস, চল মহাকাশে যাই।'

'কোথায়?'

'মহাকাশে। রকেটে করে। কেন, কথাটা কি এই প্রথম শুনলি?'

'কিন্তু রকেট কই?'

চারিদিকে তাকিয়ে দেখল লিওন্যা। পাখির খাবার দেবার জায়গাটার কাছে রয়েছে শাদা গামলাটা। গামলাটা করে খাবার বয়ে আনে ফেন্যা। আর হাঁসেরা তো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসনপত্র ভালোবাসে, তাই ফেন্যা সবেমাত্র ওটাকে ধুয়ে রোদ্দুরে শুকতে দিয়েছে।

গামলাটা নিয়ে মাথায় পরল লিওন্যা।

'এই তো হেলমেট হয়ে গেল। আমি যেন এখন রকেটে।'

'আর আমি?' জিজ্ঞেস করলে আরিঙকা।

'তুইও এখন যেন রকেটে।'

'আর হেলমেট?'

'ধরে নে হেলমেট পরে আছিস। এবার তৈরি! স্টার্ট!'

লিওন্যা হাত দুলিয়ে স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে উড়ে গেল একেবারে মেঘগুলোর নিচে। ওহ, কী ফাঁকা! ওহ, কী মজাই না শুরু হল! লিওন্যা আর আরিঙকা উড়ছে নিজের নিজের রকেটে, চারিপাশে তাদের ঘূর্ণিঝড়, ছিটকে উড়ে যাচ্ছে মেঘ।

হঠাৎ রেডিওয় ডাক দিলে লিওন্যা:

'অ্যাটেনশন, অ্যাটেনশন! আমি ঈগল বলছি! আমি ঈগল বলছি! চামচিকে — তুই আমায় শুনতে পাচ্ছিস?'

'আমি চামচিকে বলছি! আমি চামচিকে বলছি!' কোন অজানা রাজ্য থেকে জবাব এল আরিঙকার, 'শুনতে পাচ্ছি!'

'চামচিকে, পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছিস?'

'না, চারিদিকে কেবল মেঘ।'

'আমি দেখছি, পৃথিবীটা নীল গোলকের মতো। চামচিকে আরো ওপরে ওঠ!'

'ওপরে উঠছি! আমিও দেখতে পাছি: পৃথিবী — নীল গোলক!'

'চামচিকে, তোর ওজন আছে এখন?'

'কীসের ওজন?'

'মানে কোনো ওজনই তোর থাকবে না। উলটিয়ে মাথা নিচু করে ভেসে যেতে পারছিস?'

'না তো।'

'তাহলে আরো ওপরে ওঠ!'

'উঠলাম!'

'মেঘগুলো ছাড়িয়ে?'

'মেঘ ছাড়িয়ে!'

'চামচিকে! আমি ঈগল বলছি! চল, মেঘে গিয়ে নামি! একটু জিরনো যাক!'

'ঠিক আছে ঈগল, একটু জিরোই!'

লিওন্যা আর আরিঙ্কা মেঘে নামতেই তাদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল।

'মেঘগুলো কি তুলো দিয়ে তৈরি নাকি?' জিজ্ঞেস করলে আরিঙ্কা।

'হাঁসের পালক দিয়ে,' বললে লিওন্যা, 'উহ্ কী নরম!'

শাদা মেঘের ওপর বসে রইল ওরা, ভেসে চলল নীল আকাশ দিয়ে। শরীর ঘিরে সূর্যের আলো আর তাপ, আড়াল নেই কোথাও।

'স্টার্ট দিচ্ছি,' চ্যাঁচাল লিওন্যা, 'মহাকাশ!'

ফের ওপরে উঠল তারা।

ফের পাক দিতে লাগল ঘূর্ণিঝড়, ছিটকে ছিটকে গেল শাদা মেঘ।

'কী লাগিয়েছে ও দুটোতে!' হঠাৎ হেঁড়ে গলায় কে যেন বলে উঠল একেবারে পাশ থেকেই, 'ছুটছে যেন ঘর-পোড়া গরু, এটার মাথায় আবার একটা গামলাও দেখছি!'

সঙ্গে সঙ্গেই লিওন্যা আর আরিঙ্কা নেমে এল মর্ত্যে। একেবারে সাধারণ কঠিন মাটিতে, গাঢ় রঙের সোঁদা বালিতে। চারিপাশে আর শাদা মেঘ নয়, উড়ছে নিতান্ত সাধারণ পপলার গাছের শাদা ফেঁসো। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল আরিঙ্কার দাদা কোর্নেই। অতি বুদ্ধিমান লোক সে, দুনিয়ার সব কিছু সে জানে।

'আমরা মহাকাশে গিয়েছিলাম,' বললে আরিঙ্কা।

'তোরা স্রেফ তীর ধরে ছোটাছুটি করে হাঁসগুলোকে ভয় খাওয়াচ্ছিলি,' বললে কোর্নেই, 'আর কিস্যুই করিস নি!'

'তুই যে জানিস না, তুই তো দেখিস নি,' বললে লিওন্যা।

'হা-হা-হা!' কড়া অট্টহাস্য করলে কোর্নেই, 'আর গামলা মাথায় তুই কী দেখলি শুনি?'

হাঁসের খাবার দেবার জায়গাটার কাছে গামলাটা নামিয়ে রাখল লিওন্যা। হঠাৎ তার ভারি একঘেয়ে লাগল। এত একঘেয়ে যে কান্না পাবে আর কি। কিন্তু একঘেয়ে লাগার কী আছে? কোর্নেই তো সত্যি কথাই বলেছে। এটা কি আর হেলমেট, এতো নিতান্ত সাধারণ একটা শাদা গামলা।

তারপর কী ভেবে ভুরু কুঁচকে আপন মনেই বললে, 'যাই বলিস, হেলমেট ছিল বৈকি, নিশ্চয় ছিল!'

পাজীটা আছে কাছেই কোথাও

ফেন্যা বললে:

'এবার খেতে বসব আমরা, সায়রে গিয়ে তোরা ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে আয়। এরকম নোংরা হাতে তোদের মহাকাশে যেতে দিল কী আক্কেলে!'

লিওন্যা তার হাত দু'খানার দিকে চাইলে। সত্যিই নোংরা। কিন্তু ময়লাটা লাগল কখন? যখন চরে গিয়েছিল তখন? নাকি খড় বিছাবার সময়?

'আমার হাত অনেক পরিষ্কার,' বললে আরিঙকা, 'তাহলেও চল যাই, ধুয়ে আসি!'

'আমার হাত একদম পরিষ্কার,' বললে কোর্নেই, 'তাই সায়রে যাচ্ছি না।'

জলের দিকে ছুটে গেল লিওন্যা আর আরিঙকা।

'উঁহু, এ জায়গাটা ভালো না,' বললে আরিঙকা, 'হাঁসগুলো ঘোলা করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমরা ঘোলা করে ফেলেছি,' বললে বড়োসড়ো শাদা একটা হাঁস, 'আমরা এখন ডুব দিই কেবল তীরের কাছে।'

'শুনলি?' ফিসফিস করে লিওন্যা চাইল আরিঙকার দিকে।

'কী?'

'হাঁসটা কী বললে?'

'হাঁস?'

'হ্যাঁ, আমি বলছিলাম,' বললে হাঁসটা, 'কে যেন একজন কথা দিয়েছিল যে ভোঁদড় ধরবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই তো কথা বলছে,' ফিসফিস করে বললে আরিঙকা, 'কী ব্যাপার বল তো?'

'অবাক হবার কী আছে?' বললে লিওন্যা, 'অনবরতই তো ওরা কথা বলাবলি করে।' তারপর হাঁসটার দিকে ফিরে বললে, 'হ্যাঁ, আমি কথা দিয়েছিলাম। ভোঁদড় ধরব। যেই দেখা দেবে অমনি ধরব!'

'দেখা তো দিয়েই আছে,' বললে হাঁসটা, 'মাছ ধরছে। একটা খাচ্ছে তো, দশটা মারছে। তারপর ফেলে দিচ্ছে। একেবারে খামোকা... ধিক, ধিক, ধিক...'

'অমন দাঁড়িয়ে আছিস যে?' হেঁড়ে গলায় চ্যাঁচাল কোর্নেই। তাকেও হাত ধোবার জন্যে পাঠিয়েছিল ফেন্যা। 'জীবনে হাঁস দেখিস নি বুঝি?'

'আস্তে!' চটে উঠল আরিঙ্কা, 'হাঁসগুলো যে কথা কইছে কানে যাচ্ছে না?'

'হা-হা-হা! বেশ কানে যাচ্ছে। কালা তো নই। বলছে, প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক।'

'প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক,' বলে ধীরে ধীরে সাঁতরে গেল হাঁসটা।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে আরিঙ্কা আর লিওন্যা।

'চল, আরো এগিয়ে যাই,' বললে আরিঙ্কা, 'এখানকার জলটা ঘোলা।'

'যত ঢঙ!' বললে কোর্নেই, 'জল হলেই হল,' বলে হাত ধুতে লাগল।

লিওন্যা আর আরিঙ্কা কিন্তু ছুটে গেল আরো দূরে। ছুটে গেল সেইখানে যেখানে তারের বেড়া শেষ হয়েছে, হলদে বালির ওপরে যেখানে একটি হাঁসও নেই, টলটলে জলের একেবারে তলটা পর্যন্ত দেখা যায়, ঢেউয়ের ওপর চিকচিক করছে রোদ্দুর।

উষ্ণ জলের ভেতর নামল ওরা। তল থেকে দানা দানা বালি নিয়ে হাত মাজল। তারপর তীর থেকে ফ্ল্যানেলের মতো পুরু গোল গোল পাতা ছিঁড়ে ঘষল। তারপর টলটলে জল দিয়ে হাত ধুয়ে নিলে।

'আর দরকার নেই,' বললে লিওন্যা।

'হ্যাঁ, হয়ে গেছে,' বললে আরিঙ্কা।

চারিদিকে চেয়ে দেখলে সে কী দিয়ে হাত মোছা যায়। হঠাৎ নজরে পড়ল তীরে একটা মাছ পড়ে আছে।

'দ্যাখ, দ্যাখ মাছ!'

মাছটা নড়াচড়া করছিল না। এমনিতে গোটাই আছে, শুধু পিঠ থেকে নরম একটু অংশ কেউ খুবলে নিয়েছে।

'ভোঁদড়!' বললে লিওন্যা, 'ভোঁদড়েই এমনি খামোকা মাছ মারে আর ফেলে দেয়। পাজীটা নিশ্চয় কাছেই কোথাও আছে।'

'তাহলে ধরছিস না কেন?' রেগে চ্যাঁচাল আরিঙ্কা, 'তুই যে কথা দিয়েছিলি! ওই দ্যাখ, আরেকটা মাছ পড়ে আছে...'

'ওই দ্যাখ, আরো একটা,' বললে লিওন্যা, 'আরো দুটো...'

'কী সর্বনেশে পাজী!' আরিঙ্কা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি, 'খিদে পেয়েছে খেল, তা নয় হত। কিন্তু খিদে নেই, শুধু শুধু লোভে লোভে নষ্ট করা। কোথায় তোর সেই চৌকিদার!'

'কোথায় আমার চৌকিদার?' পুনরুক্তি করলে লিওন্যা, চেয়ে দেখল চরটার দিকে, 'শিস দিচ্ছে না কেন?'

'চৌকিদার তোর ঘুমুচ্ছে!' বললে আরিঙ্কা, 'ঘুমুচ্ছে, কিছুই দেখছে না!'

'না গো, ঘুমুচ্ছি না আমি! হি-হি-হি! ঘুমুচ্ছি না!' আদুরে গলায় কে যেন বললে, গোল গোল কানওয়ালা গোলালো মুখটি বার করলে কালিনা ঝোপের ভেতর থেকে।

'ভোঁদভোঁ! তুই এখানে?' খুশি হয়ে উঠল লিওন্যা।

‘এই এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোদের কথাটা কানে এল,’ বললে ড়দভোঁ, ‘হি-হি-হি! আমি ঘুমুচ্ছি না। ভোঁদড় ফোঁদড় কোথাও এখানে নেই।’

‘কিন্তু মাছগুলো?’ জিজ্ঞেস করলে আরিঙকা।

‘হি-হি-হি! দাঁড়কাকে ঠুকরে খেয়েছে। নিজের চোখে দেখেছি। রোদ পোয়াবার জন্যে অত তীরের কাছে আসার কী দরকার পড়েছিল মাছগুলোর? দাঁড়কাকগুলো তো আর বসে বসে হাই তুলবে না। হাঁসের ওপরেও ছোঁ দিতে পারে। বাচ্চা হাঁস আর কি! ফুঃ-ফুঃ! খুবই সোজা!’

‘দাঁড়কাক?’

‘হি-হি-হি! দাঁড়কাক, দাঁড়কাক! মস্ত এক সংসার পেতেছে ওরা, তোদের হাঁস-খামারের পাশেই। নিজের চোখে দেখেছি!’

‘ড়দভোঁ, আয় না আমরা একটু খেলি!’ বললে আরিঙকা, ‘তোর গায়ে একটু হাত বুলোতে ইচ্ছে করছে।’

‘উঁহু, উঁহু, ওটি হবে না,’ বলে ঝোপের আরো ভেতর দিয়ে সেঁধিয়ে গেল ড়দভোঁ। ‘ঘুমতে যাচ্ছি। রাতে পাহারা দিতে হবে তো! গায়ের লোমগুলোও একটু সাফসুফ করে নিতে হবে। জানিস তো কতো কাজ, হি-হি-হি! আসি!’

অদৃশ্য হল জন্তুটা।

‘ড়দভোঁ চলে গেল, ভারি খারাপ লাগছে,’ বললে আরিঙকা, ‘ভারি মিষ্টি ও, নিচের ঠোঁটের ওপর কেমন একটা শাদা ছিট। দেখেছিলি?’

‘দেখেছি বৈকি, আগেই দেখেছি।’

‘কিন্তু সবসময় অমন গা ঝাঁকাচ্ছিল কেন? ডুব দিয়ে এসেছিল নাকি?’

‘কী যে বলিস!’ আপত্তি করল লিওন্যা, ‘এমন কি জলে থাবা ভিজতেও ও ভয় পায়।’

‘আচ্ছা... লিওন্যা... ও-ই মাছ খায় নি তো?’

‘কী যে বলিস! বেঁচি ছাড়া ও আর কিছুই খায় না।’

‘হ্যাঁ,’ সায় দিল আরিঙকা, ‘এমন ও আদুরে। ও কি আর কাউকে কামড়াতে পারে?’

দূর থেকে ফেন্যা ডাকল ওদের:

‘খাবার দেওয়া হচ্ছে, খাবার!’

‘যাচ্ছি!’ সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে ছুট লাগাল লিওন্যা আর আরিঙকা।

‘ড়দভোঁ এসেছিল আমাদের কাছে,’ চ্যাঁচালে আরিঙকা, ‘কথা বললে!..’

‘ওহ্!’ দীর্ঘশ্বাস ফেললে ফেন্যা, ‘আগে একটির মাথা থেকে সব বেরুচ্ছিল, এখন দুটিতে জুটেছে! তুইও ওদের সঙ্গে জুটবি নাকি?’ কোর্নেইকে জিজ্ঞেস করলে সে।

‘নাহ্!’ ঠোঁট বেঁকিয়ে মাথা নাড়ল কোর্নেই, ‘পাগল নাকি? আমি অমন হাঁদা নই! আমার হাঁসেরা কথা বলে না!’

হাঁসেদের খাবার পছন্দ হল না

গরম আলুসিদ্ধে ভরে উঠল জামবাটি, অল্প নোনা শসা থেকে দাঁতে কাটার কচকচ শব্দ উঠল। ডিম, বিলাতি বেগুন, দুধ — ফেন্যার ঝুড়ি থেকে ঝটিতি সব উধাও হল। এমন স্বাদের খাওয়া ওরা আর কখনো খায় নি।

'আচ্ছা, কেন বল তো?' অবাক হল আরিঙ্কা, 'বাড়িতে সুপ, মাংস সবই থাকে, অথচ খেতে ইচ্ছে করে না। আর এখানে, এই সায়রের তীরে, সবই কী মিষ্টি!'

'তার কারণ তীরটা যে যাদু করা।' বললে লিওন্যা।

'হা-হা-হা! যাদু করা!' হাসতে হাসতে ঘাসে লুটিয়ে পড়ল কোর্নেই, 'হা-হা!'

কিন্তু লিওন্যা আর আরিঙ্কা ওর দিকে চেয়েও দেখলে না।

ফেন্যাকে লিওন্যা বললে:

'হাঁস-খামারের কাছে দাঁড়কাকে বাসা পেতেছে। গোটা একটা সংসার।'

'বাচ্চা হাঁসগুলোকে ওরা ঠুকরে খেয়ে দিতে পারে,' বললে আরিঙ্কা, 'মাছ তো আগেই খেয়েছে।'

'কী বলছিস? একটু গুছিয়ে বল তো শুনি,' বললে ফেন্যা।

ঘটনাটা বললে ওরা। ড়দভোঁর কথাটাও।

ফেন্যা বললে:

'তোদের ড়দভোঁ তোরা বুঝবি, কিন্তু ঐ যে খুবলে খাওয়া মাছ পড়ে আছে, ওটা দাঁড়কাকের কাজ নয়। সায়রে গিয়ে দাঁড়কাক ছোঁ দিতে পারে না। ওগুলো খেয়েছে ভোঁদড়ে।'

'তার মানে, ড়দভোঁ মিছে কথা বলছে?' ক্ষুণ্ণ হল লিওন্যা।

কিন্তু হাঁসের কথাটা মনে পড়ে গেল আরিঙ্কার। বললে:

'আর হাঁসটা কী বলেছিল মনে নেই? তার মানে হাঁস মিছে কথা বলেছে?'

'আহ থাম তো, আমার মাথা খারাপ করে দিবি তোরা,' বললে ফেন্যা, 'সন্ধের দেরি নেই, বিপদ আপদ কতো — ভোঁদড় রয়েছে, দাঁড়কাক রয়েছে, আর তোরা যত সব উদ্ভট জিনিস বানিয়ে চলছিস!'

'হ্যাঁ, সন্ধে ঘনিয়ে আসছে,' বললে কোর্নেই, 'আমি বরং বাড়িই চলে যাই। কী হবে এখানে এই সায়রে বসে থেকে। সূর্য পাটে বসলে, ঠান্ডা লাগবে। বাড়িই ভালো। চল আরিঙ্কা, বাড়ি যাই।'

আরিঙ্কা মুখ ফিরিয়ে নিলে:

'যেতে হয় তুই যা। আমি হাঁস পাহারা দেব।'

'রাতে ঠান্ডায় জমে যাবি।'

'জমি জমব। চারিদিকে কত বিপদ আপদ আর আমি চলে যাব বাড়ি?'

'আমি অমন হাঁদা নই। ঘটে কিছু বুদ্ধি রাখি। গরম লেপের তলে ঘুম দেব।'

'শোন তুই, অতিবুদ্ধিমান কোর্নেই,' ফেন্যা বললে, 'তোর বাবাকে গিয়ে বলবি যে হাঁসের পাঁচমিশেলী খানা ফুরিয়ে গেছে। আজ পেঁছে দেবার কথা ছিল, কিন্তু কই এল না তো। ব্রিগেডিয়ার যেন হুকুম দিয়ে দেয়।'

'বেশ, বলে দেব।'

চলে গেল কোর্নেই।

'আর আমরা সবাই মিলে এখন হাঁসদের খাওয়াব,' বললে ফেন্যা, 'চল, তোরা গিয়ে পেষাই কলটা ঘোরাবি।'

'ফের খাওয়া?' অবাক হল আরিঙ্কা, 'তুমি যে কিছু আগেই ওদের খাওয়ালে। সারা দিন ধরেই তো ওদের খাওয়াচ্ছ।'

ফেন্যা বললে:

'খাক না, যত খাবে, তত বাড়বে।'

প্রথমে ফেন্যা পেষাই কলটা ঘোরাতে লাগল, লিওন্যা আর আরিঙ্কা তাতে ঢালতে লাগল কাঁচ সবুজ ভুট্টা। তারপর লিওন্যা আর আরিঙ্কা হাতল ঘোরাতে লাগল, ভুট্টা জোগাতে লাগল ফেন্যা। রসালো ডাঁটিগুলো কাটতে লাগল কচকচ করে, বেরিয়ে এল একটা সরস সবুজ পিন্ড হয়ে। সবুজ মোহনভোগের একটা ঢিপি!

ফেন্যা বললে:

'কী পোড়া কপাল দেখ দেখি! পাঁচমিশেলী খানা এক্কেবারে নেই!'

'কেন, কী আছে ঐ পাঁচমিশেলী খানায়?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা, 'তা ছাড়া কি হাঁসেরা বাঁচে না?'

'এই তোর বুদ্ধি! আবার বলিস কিনা মহাকাশে উড়ছিস! পাঁচমিশেলী খানা হল নানা রকম খাদ্য মিলিয়ে তৈরি করা। দরকারী সব ভিটামিন আর রাসায়নিক উপাদান আছে তাতে। শুধু এই পিন্ড খাইয়ে গেলে ওদের রুচবে না, অসুখে পড়বে... এ সব তোদের জেনে রাখা দরকার। তোদেরও তো পরে কাজ করতে হবে!'

'এখনই করব!' বললে লিওন্যা।

ঝুড়িটায় সবুজ পিন্ড বোঝাই করলে সে, নিয়ে গেল হাঁসগুলোর কাছে। ওরাও অপেক্ষায় ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই দল বেঁধে ঠোকরাতে শুরু করলে। সবুজ মোহনভোগটা ওদের ভালোই লাগছিল।

'খাসা হয়েছে, খাসা!' নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল হাঁসগুলো, 'কাঁচা শবজি আমাদের খুব দরকার। বুনো হাঁস হলে আমরা নিজেরাই যত শবজি খুঁজে বেড়াতাম। কিন্তু আমরা যে পোষা হাঁস, এখানে শুধুই বালি। কাঁচা শবজি পাব কোথায়? অথচ খুবই আমাদের তা দরকার।'

লিওন্যা তাদের বললে:

'বেশ তো, তৃপ্তি করে খাও। আরো নিয়ে আসছি।'

'তবে এও বলি, আজকের খাওয়াটা খুব খারাপই হল,' বীরস গলায় বললে একটা জোয়ান হাঁস, 'খাবারে একেবারেই মাছের গুঁড়ো নেই। বীট নেই। খৈল নেই।'

'সত্যি, কত দিন থেকে রোজ কেবল একই খাওয়া,' বললে আরেকটা হাঁস, 'ক্যালসিয়ম কই? দুনিয়ায় কি খড়িও পাওয়া যাচ্ছে না?'

'ফেন্যা কি চায় যে আমরা রিকেট রোগে ভুগি?' বললে তৃতীয় একটা হাঁস, 'সে কি এটাও জানে না যে ক্যালসিয়ম ছাড়া আমাদের হাড়ে ঘুণ ধরবে?'

'লবনও আমাদের দরকার,' পোঁ ধরলে আরেকজন।

'ফেন্যা জানে, জানে!' তাড়াতাড়ি করে জবাব দিলে লিওন্যা, 'কাল তোমাদের জন্যে আসবে পাঁচমিশেলী খানা। খৈল থাকবে, খড়ি থাকবে, মাছের গুঁড়ো থাকবে। সব পাবে!'

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামল। ধীরে ধীরে চালার নিচে গিয়ে জুটতে লাগল হাঁসগুলো। সারি সারি তারা বসে পড়ল খড়ের বিছানায়, যেন সারি সারি পিঠে ভাজতে দেওয়া হয়েছে চুল্লিতে।

শান্ত হয়ে এল সায়রের তীর। কালচে হয়ে এল বালি, কালচে হয়ে এল জল। ঘরে লণ্ঠন জ্বাললে ফেন্যা। বললে:

'হাঁসেরা শুতে গেছে, তোরাও শুয়ে পড়। তুই আরিঙ্কা, শুবি ওপরের মাচাটায়, জায়গাটা গরম। আর তুই লিওন্যা, শুবি নিচের মাচায়।'

'আর তুমি শোবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা।

'আমি থাকব তীরে, আমার ঘুমনো বারণ। হাঁসগুলোকে পাহারা দিতে হবে।'

'আমরা পাহারা দেব,' বললে লিওন্যা, 'তুমি বরং ঘুমিয়ে নাও!'

'তুমি ঘুমিয়ে নেবার পর আমরা শোব,' বললে আরিঙ্কা, 'এখন আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না!'

'বেশ,' সায় দিলে ফেন্যা, 'তবে ভালো করে পাহারা দিস, ঢুলিস না!'

'না, না, ঢুলব না!'

শুতে গেল ফেন্যা। আর লিওন্যা আর আরিঙ্কা গেল হাঁস পাহারা দিতে।

সবচেয়ে বিদ্বান কাগতাড়ুয়ার কাছে

সায়রের জল শান্ত, কোনো মর্মর নেই তাতে। চরের গাছগুলো শান্ত। আর গাছগুলোর ওপরে শান্ত হয়ে আছে গোধূলির হলুদ আভা।

'এখনো রাত হয় নি, অথচ গা ছমছম করছে,' ফিসফিসিয়ে বললে আরিঙ্কা।

'কোনো ভয় নেই,' জোর গলায় জবাব দিলে লিওন্যা, 'ওই দ্যাখ না, চাঁদ উঠছে, অন্ধকার পালাবে।'

তীর ধরে চলল দু'জনে, পায়ের নিচে মুড়মুড় করছে বালি। হাঁসগুলো মাথা তুলে কান পাতলে, তারপর আস্তে বলাবলি করলে:

'নিজেদের লোক। লিওন্যা আর আরিঙ্কা আমাদের পাহারা দিচ্ছে। ঘুমোও, ঘুমোও... লিওন্যা আর আরিঙ্কা আছে এখানেই, আমাদের কাছেই... ভয় নেই... ঘুমোও...'

'ওই, লিওন্যা,' হঠাৎ বলে উঠল আরিঙ্কা, 'কে ভাই ওখানে ঢিপিটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে?'

'কোথায়?'

'ওই তো হাঁস চরবার আঙিনাটার কাছে। ওই তো দাঁড়িয়ে, মাথায় টুপি!'

লিওন্যা তাকিয়ে দেখল।

'আরে, ওটা যে আমাদের কাগতাড়ুয়া। চিনতে পারলি না?'

'না লিওন্যা, কাগতাড়ুয়া নয়। একটা লোক। হাত নাড়াচ্ছে।'

'হাত? ওটার আবার হাত আছে নাকি। চল তো, দেখি।'

এগিয়ে গেল লিওন্যা, উঁচু ঢিপিটার ওপরে যেখানে পোঁতা আছে কাগতাড়ুয়া। আরিঙ্কা ভেবে পেল না কী করবে। যেতে ভয় করছিল, একলা পড়ে থাকাও আবার আরো ভয়ঙ্কর। লিওন্যার সঙ্গ ধরার জন্যে ছুট লাগাল সে।

হ্যাঁ, সত্যিই ওটা কাগতাড়ুয়া। দিনের বেলায় আরিঙ্কা ওটাকে দেখেছিল। সাধারণ একটা গুঁড়ি, ছেঁড়া কার একটা কোট পরানো, মাথার বদলে পুরনো একটা টুপি। দাঁড়কাক তাড়াবার জন্যে ওটাকে পোঁতা হয়েছে এইখানে।

লিওন্যা আর আরিঙ্কা ছুটে উঠল ঢিপিটায়।

'দ্যাখ, দ্যাখ কী খাশা!' বললে লিওন্যা, 'কাগতাড়ুয়া বসাবার মতোই জায়গা বটে। চারদিকটা সব দেখা যায় এখান থেকে, কাগতাড়ুয়াও সব দেখে।'

'নমস্কার, কাগতাড়ুয়া,' বললে আরিঙ্কা, 'তোমায় দেখে আর ভয় লাগছে না আমার!'

'নমস্কার,' ক্যাঁচম্যাচ করে উঠল কাগতাড়ুয়া, 'আমায় দেখে কেউই ভয় পায় না।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে লিওন্যা আর আরিঙ্কা। কাগতাড়ুয়া যে ওদের দেখতে পাচ্ছে, কথা শুনছে!

'তোমার এখানে একটু বসব, কেমন?' বললে লিওন্যা।

'খুবই আনন্দের কথা,' বললে কাগতাড়ুয়া, 'একা একা আমার বড়ো একঘেয়ে লাগে। বিশেষ করে রাতে। ওই তো কাঠের গুঁড়ি আছে, বসো না!'

লিওন্যা আর আরিঙ্কাও বসে পড়ল।

'কেন যে লোকে কাগতাড়ুয়া বসায় একটা করে। দুটো তিনটে করে বসালেই হত। কাকেরাও ভয় পেত বেশি, আমাদেরও অমন একঘেয়ে লাগত না। দিনের বেলাটা নিয়ে তো ভাবনা নেই, নানান কাজে কেটে যায়। খারাপ পশু পাখি দেখলেই তাড়া লাগাই, প্রাণপণে হাত নাড়ি। তবে ওই আস্তিন নাড়ায় ওদের অভ্যেস হয়ে যায়। ভয় আর পায় না। গলায় জোর থাকলে চেঁচাতাম। অন্তত দুটো পা থাকলেও নয় দৌড়ে যেতাম, তাড়া দিতাম। কিন্তু এক ঠ্যাঙে কি আর তা সম্ভব?'

'সত্যি,' বললে আরিঙ্কা, 'এক ঠ্যাঙে ভারি অসুবিধে।'

'লোকেও ভারি আচ্ছা, বিশেষ করে বয়স্করা। বেখাপ্পা কিছু চোখে পড়লে যতই ক্যাঁচকুঁচ করি, কিছুই শোনে না। কখনো দেখি, দুবলা হাঁসটার কথা ভুলে গেছে। সবাই ঠোকরাচ্ছে ওকে। ক্যাঁচকুঁচ করে বলি, "শীগগির ধরো ওটাকে, বাঁচাও, সরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে মারা পড়বে!" কানেই যায় না। হয়ত নজরে পড়ল, বিছানার খড়গুলো ভেজা। ফের বলি, "বিছানা বদলাও, হাঁসগুলো রোগে পড়বে, মারা যাবে।" শুনতেই পায় না। একবার আমার কথাটা কানে গিয়েছিল। খামারের প্রাণীবিশেষজ্ঞের কানে গিয়েছিল কথাটা। কিন্তু কী হল? বলে, "কী এখানে ক্যাঁচক্যাঁচ করছে।" কী তার রাগ! "কাগতাড়ুয়াটা নাকি? ওটার আর কিছুই সইছে না। মন ওর উঠছে না। ভেঙে ফেলে দেওয়াই দরকার।" কে আর ওকে বোঝাবে। তাই আস্তিন নাড়ি, ক্যাঁচকুঁচ করি — সবই বেফয়দা। তাহলেও বুকটা তো টনটন করে!'

'ভারি ভালো লোক তুমি কাগতাড়ুয়া,' বললে লিওন্যা, 'আগেই তোমার সঙ্গে আলাপ করি নি বলে এখন দুঃখ হচ্ছে।'

'এই তো আমায় বসিয়েছে সবচেয়ে বড়ো ঢিপিটায়। সবই চোখে পড়ে এখান থেকে। কোনো একটা খালখন্দে বসালেই বরং ভালো হত। কিছুই দেখতাম না। বুকও টনটন করত না।'

'তোমার কাছে আমরা রোজ আসব,' বললে আরিঙ্কা, 'রোজ সন্ধেয়। তোমারও সময় কাটবে, আমাদেরও ভালো লাগবে।'

'খুব ভালো হবে তাহলে,' নরম গলায় ক্যাঁচক্যাঁচ করল কাগতাড়ুয়া, 'সন্ধেগুলোয় আজকাল তারা ওঠে অনেক। ঐ দ্যাখো সপ্তর্ষি। আর ঐটে কালপুরুষ।'

'কী?' অবাক হল লিওন্যা আর আরিঙ্কা, 'কী বলছ তুমি?'

'নক্ষত্রমণ্ডলীর কথা বলছি। ঐ যে হাতার মতো দেখতে — ওটা সপ্তর্ষিমণ্ডলী, সাতটা তারা আছে ওতে। আর ঐ যে জ্বলজ্বলে তিনটে শাদা তারা, ওটা হল কালপুরুষের কটিবন্ধ। ওটাও একটা নক্ষত্রমণ্ডলী। আর ঐটে মঙ্গল।'

'আর এই মঙ্গলটা কী তারা?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা, 'আমাদের দেখাও না?'

'ঐ যে দেখছ, লালচে লালচে, বনগুলোর ওপরে। তবে এটা তারা নয়, গ্রহ,' বললে কাগতাড়ুয়া।

'গ্রহ মানে?'

'পৃথিবীর মতো আর কি। তবে একটু ছোটো।'

'নিশ্চয় গোলমাল হচ্ছে তোমার। পৃথিবী তো আর জ্বলজ্বল করে না। কিন্তু মঙ্গল কেমন জ্বলজ্বল করছে!'

'মঙ্গলও জ্বলজ্বল করে না। সূর্যের কিরণ পড়ে ওই রকম লাগছে।'

'কী বলছ তুমি কাগতাড়ুয়া!' হেসে উঠল আরিঙ্কা, 'সূর্য এখন কোথায়? এখন যে রাত, কোনো সূর্যই নেই আকাশে!'

'আমাদের এখানে নেই,' আপত্তি করল লিওন্যা, 'কিন্তু কোথাও না কোথাও আছে। সেখান থেকেই আলো দিচ্ছে।'

‘কিন্তু মঙ্গল গ্রহ লালচে কেন?’ জিজ্ঞেস করলে আরিঙ্কা।

‘সেটা বাপু আমি জানি না,’ বললে কাগতাড়ুয়া, ‘বিজ্ঞানীরা যা বলেন আমি শুধু তাই বলছি। আর তাঁরা বলেন যে মঙ্গল গ্রহে কোনো না কোনো প্রাণী আছে, ক্যানেল আছে সেখানে। উদ্ভিদও আছে। সেগুলো কখনো নীল হয়ে যায়, কখনো লাল।’

‘কোত্থেকে এ সব তুমি জানলে বলো তো?’ জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা, ‘থাকো তো একলা এইখানে দাঁড়িয়ে...’

‘হুঁ, হুঁ!’ হাসল কাগতাড়ুয়া, ‘খুব সোজা। ফেন্যা আমার টুপিটাকে খবরের কাগজ দিয়ে বোঝাই করেছে, যাতে ভালো করে এঁটে থাকে। তাই আমার মাথার ভেতর এখন যত রাজ্যের মহাকাশ। মঙ্গল গ্রহে যখন রকেট পাঠায়, তখন নানা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল তো।’

‘আচ্ছা!’ বললে লিওন্যা, ‘কী মজা! আমার মাথার ভেতর যদি কেউ অংক আর অনুশীলনগুলো গুঁজে দিত, তাহলে আর পড়াশুনা করতে হত না।’

‘আর আমার মাথায় কবিতা,’ বললে আরিঙ্কা, ‘আমাদের কবিতা মুখস্ত করতে হয়, কিন্তু মনেই থাকে না।’

‘হুঁ, হুঁ,’ ফের একটু হাসল কাগতাড়ুয়া, ‘কবিতাও আমার আছে। শুনবে? কিন্তু দাঁড়াও, দাঁড়াও স-স-স!’

সঙ্গে সঙ্গেই সবাই চুপ করে গেল, কান পাতলে।

‘আমার মনে হল যেন সায়রে একটা ঢেউ দেখলাম...’

লাফিয়ে উঠল লিওন্যা আর আরিঙ্কা। সবই আগের মতোই চুপচাপ। হঠাৎ কলরব করে উঠল হাঁসগুলো।

‘গতিক সুবিধের নয়!’ সজোরে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল কাগতাড়ুয়া, ‘শীগগির ছুটে যাও!’

লিওন্যা আর আরিঙ্কাও প্রাণপণে ছুটে নামল ঢিপি থেকে। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আস্তিন নাড়ালে কাগতাড়ুয়া, ক্যাঁচক্যাঁচ করতে লাগল।

ছুটে লিওন্যা আর আরিঙ্কা এল হাঁসগুলোর কাছে।

‘কী হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল লিওন্যা।

‘ভোঁদড়ের স্বপ্ন দেখেছি,’ কাঁপা-কাঁপা গলায় বললে একটা হাঁস, ‘যেন জল থেকে উঠে তীর ধরে যাচ্ছে।’

‘আর এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে...’ বললে আরেকটা হাঁস।

তীরে ফিরে এল লিওন্যা আর আরিঙ্কা। দেখে, সত্যিই বালির ওপর ছোটো ছোটো পায়ের ছাপ। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছিল, ছাপগুলো এমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে গুণতে অসুবিধা হয় না।

‘লিওন্যা,’ আরিঙ্কা আস্তে করে ওর হাতে ঠেলা দিলে, ‘সায়রে ঢেউ দেখছিস?’

সায়রটা আগাগোড়া নিশ্চল, শুধু একটি ঢেউ নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল চরের দিকে। তারপর চরে পোঁছে মিলিয়ে গেল।

'ওটা নিশ্চয় ভোঁদড়, নিশ্চয় ভোঁদড়!' বললে লিওন্যা, 'কিন্তু ড়দভোঁ গেল কোথায়? শিস দিলে না কেন?'

ঠিক সেই মুহূর্তেই চর থেকে শিস ভেসে এল:

'পিউ-পিউ! অনেক আগেই আমি শিস দিয়েছিলাম, পিউ-পিউ!..'

'আর আমরা ওখানে বসে ছিলাম, শুনতেই পাই নি।' সখেদে বললে লিওন্যা, 'দ্যাখ আরিঙ্কা, তুই তখন বলছিলি ড়দভোঁ পাহারা দিতে পারে না। কী, পাহারা দিচ্ছে কিনা?'

'এখন এক কাজ করা যাক, তীর ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না,' বললে আরিঙ্কা, 'নইলে ফের তোর ড়দভোঁ যদি শিস দেয় হয়ত শুনতে পাব না।'

'লিওন্যা, আরিঙ্কা, ঘুমুতে আয়,' ডাকলে ফেন্যা, 'এবার আমি পাহারা দেব।'

না লিওন্যা, না আরিঙ্কা, কেউ আর আপত্তি করলে না। সত্যি বলতে কি, গুটিগুটি বিছানায় ঢোকার ইচ্ছে ওদের হচ্ছিল বেশ আগে থেকেই।

'শুধু একটু নজর রেখো,' ফেন্যাকে বললে লিওন্যা, 'ড়দভোঁ যদি শিস দেয়, তাহলে বুঝবে কাছাকাছি কোথাও ভোঁদড় এসেছে।'

'আহ লিওন্যা, বিরক্ত ধরে গেল তোর এই সব পাগলামিতে,' হাই তুললে ফেন্যা, জ্যাকেটটা কাঁধে চাপালে আঁট করে, 'চাঁদিনী রাত, তোর ড়দভোঁ ছাড়াই আমি ভোঁদড় দেখতে পাব।'

'আর কাগতাড়ুয়ার কাছেও এক আধ বার যেও,' মিনতি করলে আরিঙ্কা, 'একা একা ওর খারাপ লাগে। তোমার সঙ্গে আলাপ করবে।'

'যা, যা, দু'জনেই তোরা হাঁটতে হাঁটতেই স্বপ্ন দেখছিস,' বললে ফেন্যা।

ঘরের ভেতরটায় কী আরাম, কী গরম! ওপরের মাচা, নিচের মাচা, দুটোতেই বিছানা পেতে দিয়েছে ফেন্যা। চটপট ওপরে উঠে গেল আরিঙ্কা। লিওন্যা নিচে শুয়ে ফেন্যার গরম লেপটা টেনে নিলে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তারা ভরা রাতের আকাশ...

হঠাৎ লিওন্যা দেখল যে লালচে তারাটা আকাশ থেকে নেমে আসছে। মস্ত একটা গোলক হয়ে তা আস্তে ভেসে আসছে ঘরের দিকে। লিওন্যার দিকে চেয়ে লালচে আলোয় চারিদিক ভরিয়ে তুলে চলে গেল ভেসে। তারপর দেখা দিল উল্টো দিক থেকে, আবার উঁকি দিয়ে ভেসে গেল।

'ওটা মঙ্গল গ্রহ,' মনে মনে ভাবল লিওন্যা, 'ঘরটার চারিদিকে ঘুরছে।'

আর ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেই লিওন্যা দেখল কী ভাবে আবার ঘরখানা ভরে উঠেছে লালচে আলোয়।

আর ফেন্যা ওদিকে তীরের ওপর ধুনি জ্বালিয়ে বসে রইল আগুনটার কাছে। অগ্নিকুণ্ডের কাছে বেশ লাগে, ভয় করে না। নাচানাচি, লাফালাফি করতে লাগল আগুনের শিখা, আলো হয়ে উঠল তীরভূমি।

ফেন্যা আসলে ভীতু, নিশুতি রাতের সায়রে তার সর্বদাই বড়ো ভয়। শুধু সেটা সে কাউকে বলত না।

হাঁসের রাজ্যে সোরগোল

'আর তুই কী করবি, বাড়ি ফিরে যাবি?' ফেন্যা জিজ্ঞেস করলে।

'কেন, আমি কি তোমার কাজে ব্যাঘাত করছি?' বললে লিওন্যা, 'তোমাকে বরং সাহায্যই করছি!'

'সাহায্য করছিস তা ঠিক,' বললে ফেন্যা, 'তবে ভাবলাম হয়ত তোর আর মন টিকছে না।'

'কে বললে টিকছে না,' বললে লিওন্যা, 'মোটকথা, ভোঁদড়কে না ধরে বা তার পাত্তা না করে আমি কোথাও এখান থেকে যাচ্ছি না।'

'আমারও মন টিকছে এখানে,' বললে আরিঙ্কা, 'আমিও কোথাও যাচ্ছি না।'

'বেশ তো,' ফেন্যা বললে, 'তাহলে আয়, কাজে লাগা যাক!'

'হাঁসদের খাওয়াতে হবে?'

'নিশ্চয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ হাঁস খাওয়ানো, কেবলি খাওয়ানো। শুধু খাওয়াইটা কী? এখনো পাঁচমিশেলী খানা এল না।'

ময়দা গোলার সঙ্গে মেশানো হল কাঁচা শবজি। লিওন্যা আর আরিঙ্কা তা বইতে শুরু করলে। হাঁসগুলো ঠোকর দিতে এসেই প্যাঁকপ্যাঁক করে গলা নেড়ে ছুটে চলে গেল জলে।

'না, এ একেবারে অসম্ভব,' নালিশ শুরু করলে তারা, 'এতে যে আমাদের ঠোঁট এ'টে যাবে।'

'ফের সেই ময়দা গোলা। এ যে একেবারে নিছক শ্বেতসার!'

'যা বলেছিস! শুধু এ শ্বেতসারটির ফলে আমাদের শাদা রঙটি যাবে!'

কিছু হাঁস কিন্তু চেঁচামেচি নালিশ কিছুই করলে না, শুধু চুপচাপ মুখ ভার করে সরে গেল। খেতে চাইলে না তারা, কথা বলতে চাইলে না, সাঁতার দিতে চাইলে না।

'আরিঙ্কা, দেখলি তো?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা।

'দেখছি,' প্রায় কান্না এসে গেল আরিঙ্কার, 'রোগে ধরেছে ওদের। চট করেই কেমন নোংরা হয়ে গেছে রঙ! ঐ দ্যাখ, ওই ছোটোটা একেবারেই ছেয়ে, যেন ছাই মাখা।'

এই সময় ছোটো হাঁসটাকে ঘিরে ধরে ঠোকরাতে শুরু করল অন্যগুলো।

'উহ্, এমনিতেই আমার অসুখ, তাতে আবার ঠোকরাচ্ছে,' বললে ছোটো হাঁস।

'তুই ভাগ আমাদের কাছ থেকে,' প্যাঁকপ্যাঁক করলে হাঁসগুলো, 'আমরা শাদা, ধবধবে, পরিষ্কার। আর তুই?'

ফের তারা কামড়াতে লাগল ওটাকে।

'কী করছিস তোরা? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?' ধমক দিলে লিওন্যা, 'যেটা দুবলা, তাকেই কামড়াচ্ছিস?'

'কামড়াবই তো,' বললে একটা মস্তো ঝগরুটে হাঁস, 'দুবলাকেই তো ঠোকরাতে হয়। তাগড়াইগুলোকে ঠুকরাতে যাওয়া ভয়ের কথা, পালটা কামড় দিতে পারে!'

'কী, এই কথা বলছে কিনা রাষ্ট্রীয় খামারের হাঁস?' রেগে উঠল লিওন্যা। 'দুবলাদের

মারো—এ নিয়ম আমাদের এখানে চলে না। আমাদের আইন—দুবলাদের বাঁচাও!'

কিন্তু সে কথা যেন ওদের কানেই গেল না। ফোঁসফোঁস করে এদিক ওদিক বাঁকা চোখে তাকিয়ে তারা ফের ঝাঁপিয়ে পড়ল রুগ্ন হাঁসটার ওপর।

তখন ফেন্যাকে ডাকল আরিঙ্কা:

'শীগগির এসো এখানে! সুস্থ হাঁসগুলো অসুস্থদের মারছে, তাতে আবার কী সব গালাগালি দিচ্ছে বিছছিরি!'

তাড়াতাড়ি ছুটে এল ফেন্যা।

'ঈস, কী সর্বনাশ! চল, রুগ্ন হাঁসগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই শীতে থাকবার ঘেরটায়, নইলে একেবারেই ঠুকরে মারবে!'

তিনজনে মিলে ওরা রুগ্ন হাঁসগুলোকে ধরতে লাগল।

'আগে ওদের একটু ধুয়ে নিলে হয় না?' বললে আরিঙ্কা, 'হয়ত শাদা হয়ে যাবে।'

'না রে,' ফেন্যা বললে, 'জলে ধুয়ে ওদের রঙ ফেরানো যায় না। শাদা হবে কেবল ভালো খাবার পেলে।'

গোটা ঝাঁক ঘুরে ঘুরে ওরা দুবলা হাঁসগুলোকে ধরলে, শীতে থাকার ঘেরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখল।

ফেন্যা বললে:

'এটাকেও ধর, ওই মস্তো মারকুটেটাকে। ওরও পালকের কোথাও কোথাও ছাই ফুটছে।'

দিনের রান্না করতে গেল ফেন্যা। আর সেই যে বড়ো হাঁসটা দুবলাদের ঠোকরাচ্ছিল তাকে ধরতে গেল লিওন্যা আর আরিঙ্কা।

'করছ কী তোমরা? করছ কী?' চ্যাঁচাল হাঁসটা, 'আমি যে সুস্থ শাদা হাঁস!'

ডানা ঝটপট করে ছুটে পালাল ওটা। তারপর হঠাৎ বসে পড়ল, যেন পাদুটো আর নেই। অমনি একটা মস্তো শাদা হাঁস ছুটে এসে ভয়ানক ঠোকরাতে লাগল তাকে।

'আমায় ঠোকরাচ্ছ কেন? আমি তো শাদা!'

'না, পুরো শাদা তুই আর নোস! শাদা সে হলাম আমি। কালচে হয়ে উঠেছে তোর গলার আর ডানার পালক।'

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি কী দোষ করলাম? আমায় ঠোকরাবে কেন? ওটা তো আমার অপরাধ নয়, আমার অসুখ!'

এই সময় লিওন্যা এসে চেপে ধরল ওকে।

'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!' ককিয়ে উঠল হাঁসটা।

'কাঁদছিস কেন?' আরিঙ্কা ওকে বোঝাতে লাগল, 'আমরা যে তোকে সারিয়ে তুলব, খাওয়াব। আর এখানে তোকে একেবারেই ঠুকরে মারবে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠুকরেই মারবে,' বললে হাঁসটা, 'দুবলাদের ঠোকরাতে লজ্জাও করে না!'

'আর তুই যখন অন্য দুবলাগুলোকে ঠোকরাচ্ছিলি, তখন তোর লজ্জা করেছিল?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা।

হাঁসটা চুপ করে গেল। চুপ করেই রইল সারাটা পথ। কেবল শীতের ঘেরটায় পেঁছে অস্ফুট স্বরে বললে:

'আর কখনো আমি দুবলাদের ঠোকরাব না। ভারি বিছছিরি সেটা।'

'তাও ভালো যে অন্তত এটুকু চৈতন্য তোর হল,' ঘেরের মধ্যে হাঁসটাকে ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বললে লিওন্যা।

এদিকে অপেক্ষায় অপেক্ষায় গেল গোটা দিনটা—এই বুঝি ট্রাকের শব্দ ওঠে, এই বুঝি খানা এল, কিন্তু বেলা গড়িয়ে সন্ধে আসে আসে, গাড়ির কোনো পাত্তা নেই।

'কোর্নেই কি বলে নি কিছু? ভুলে গেল নাকি!' চিন্তিত হয়ে উঠল ফেন্যা, 'আমাকেই দেখছি যেতে হয়।'

'ছোটো,' বললে লিওন্যা, 'শিগগিরই আঁধার হয়ে যাবে।'

'কিন্তু যাই কী করে? তোদের এখানে ফেলে যাব? তা হয় না!'

কী করবে ফেন্যা ভেবে পাচ্ছিল না, চোখ ছলছল করে উঠল তার।

'মাসখানেক হল হাঁসগুলোকে কেবল ময়দা গোলা খাওয়াচ্ছি,' কে জানে কার কাছে সে নালিশ করলে, 'মেরামতির জন্যে বন্ধ ছিল কারখানাটা, এদিকে আমাদের ভাঁড়ার খালি। ভারি সব কর্তা হয়েছেন। কিন্তু এখন তো কারখানা খুলেছে, তাহলেও হাপিত্যেশে বসে আছি। না, নিজেই ছুটে যাই।'

মাথায় বাঁধার রুমালটা নেবার জন্যে ঘরে গেল ফেন্যা।

'কাগতাড়ুয়া যেন কী একটা ইশারা করছে,' বললে আরিঙ্কা।

'ডাকছে বোধ হয়,' বলে লিওন্যা ছুটে গেল টিপিটার ওপর কাগতাড়ুয়ার কাছে।

'কতক্ষণ থেকে হাত নাড়ছি, চোখেই পড়ে না,' ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল কাগতাড়ুয়া, 'ফেন্যার যেতে হবে না। গাড়ি আসছে।'

'কোথায়?'

'ওই যে, ধুলো দেখছিস না?'

'দেখছি।'

'ওই তো গাড়ি আসছে।'

এবার লিওন্যাও দেখতে পেল ট্রাকটাকে।

'হুররে! গাড়ি আসছে আমাদের! পাঁচমিশেলী খানা নিয়ে আসছে!'

প্রায় ডিগবাজি খেয়ে টিপি থেকে নামল লিওন্যা। কাগতাড়ুয়াকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেল।

'ফেন্যা, ফেন্যা! গাড়ি আসছে! গাড়ি আসছে! টিপিটা থেকে দেখলাম।'

'বরাবরই এই হয়,' কাগতাড়ুয়া কিঁচকিঁচ করে উঠল এমনভাবে যে প্রায় শোনাই যায় না, 'লোককে কিছু একটা ধরিয়ে দিলে তো বাস, তার ধারণা হবে ওটা ওর নিজেরই ভাবা, নিজেরই করা, নিজেরই বুদ্ধি... তবে ওতে কিছু যায় আসে না। উপকার হলেই হল। পাঁচমিশেলী খানা যদি আসে, তাহলে আনন্দের কথা! হাঁসগুলো সুস্থ হবে! নয়ত ভাবনায় চিন্তায় বুকটা আমার বড়োই টনটন করে। পচে না যায়!'

লিওন্যা আর আরিঙ্কা ছুটে গেল ফটক খুলতে। খুললে একেবারে পুরোপুরি হাট করে, ট্রাক চলে গেল সোজা খানাগুদামের সামনে।

'এল যা হোক!' চ্যাঁচাল ফেন্যা, 'হাপিত্যেশে বসে আছি!'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ব্রিগেডিয়ার।

'নমস্কার, ফেন্যা।'

'নমস্কার! যাক বাঁচালেন! কেবিনে আরেকজন কে যেন রয়েছে?'

'আমি,' বলে কোর্নেই-ও বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

'আরে কোর্নেই যে। বাহবা!' বললে লিওন্যা, 'পুরো এক ট্রাক খাবার এনেছে।'

'তাতে হলটা কী...' অনিচ্ছায় জবাব দিলে কোর্নেই।

'কিন্তু কাল সন্ধেয় এলেন না কেন?' জিজ্ঞেস করলে ফেন্যা, 'আমি নিজেই আপনাদের দপ্তরে যাব ভাবছিলাম। মনে হল, কোর্নেই হয়ত বলে নি। আপনারা হয়ত ভুলে গেছেন।'

'ভুলে যাব, কী বলছ ফেন্যা?' বললে ব্রিগেডিয়ার, 'আগে তো কারখানাটায় খানা ছিল না। কাল থেকে আমাদের ট্রাক সেখানে দাঁড়িয়ে। কারখানা খুলতেই আমরা প্রথম!'

'যাক, বাঁচা গেল!'

'কিন্তু কোর্নেই সম্বন্ধে কী যেন বলছিলে? আমাকে তার কী বলার কথা ছিল?'

'ওই তো, পাঁচমিশেলী খানা যেন তাড়াতাড়ি পাঠান।'

'ওহো,' বলেই হঠাৎ হাসতে লাগল ব্রিগেডিয়ার, 'কোর্নেইয়ের ভরসায় থাকলেই হয়েছিল আর কি!'

তারপর ঘটনাটা বললে।

কোর্নেই এসে নাকি বলে:

'ওদের ওখানে মাছহেঁসেলী খানা চাই।'

শুনে অবাক হয়ে যায় ব্রিগেডিয়ার।

'কিসের মাছ? কোন হেঁসেলের খানা?'

'আমি তা কোত্থেকে জানব,' বললে কোর্নেই, 'আমায় বলে দিলে মাছহেঁসেলী খানা চাই।'

'আমি কি হেঁসেলের কারবারী? মাছই বা এর মধ্যে এল কোত্থেকে। নিশ্চয় তোর একটা ভুল হয়েছে।'

'ভুল হবে মানে? আমি কি হাঁদা নাকি?'

সুতরাং ব্রিগেডিয়ার কিছুই বুঝতে পারে নি।

'এখন বুঝতে পারছি,' হাসতে হাসতে বললে ব্রিগেডিয়ার, 'পাঁচমিশেলী খানার কথাটা গুলিয়ে ফেলেছিল।'

'ছ্যা, ছ্যা, আবার বলে কিনা অতি বুদ্ধিমান কোর্নেই!' হেসে বললে লিওন্যা।

'তাতে কী হল?' জবাব দিল কোর্নেই, 'বুদ্ধিমানেরও ভুল হয়।'

ড্রাইভার আর ব্রিগেডিয়ার ট্রাকের ডালা খুলে বস্তাগুলো বয়ে নিয়ে গেল গুদামে।

ফেন্যাও হাত লাগালে ওদের সঙ্গে।

ব্রিগেডিয়ারকে ফেন্যা বললে:

'বন্দুক দিয়ে কাউকে পাঠাবেন। ভোঁদড়ের উৎপাত শুরু হয়েছে এখানে, মাছগুলোকে ছারখার করছে। হাঁসগুলোর পেছনে আবার না লাগে!'

ব্রিগেডিয়ার কথা দিলে:

'বনরক্ষককে অনুরোধ করব। এসব জন্তুদের সে ভালো চেনে। শুধু আগে জানতে হবে কোথায় ওটা থাকে, এই তীরে, নাকি চরে।'

'খুঁজে বার করে দেব,' তাড়াতাড়ি করে বললে লিওন্যা, 'বার না করা পর্যন্ত থামছি না!'

ড্রাইভার আর ব্রিগেডিয়ার বিদায় নিয়ে চলে গেল।

'আর তুই রয়ে গেলি যে?' কোর্নেইকে জিজ্ঞেস করলে আরিঙ্কা, 'সন্ধে হতে দেরি নেই, আর তুই না বুদ্ধিমান, গরম বিছানায় শুতে ভালোবাসিস?'

'হ্যাঁ, হাঁদা তো নই। সন্ধে হলেই বাড়ি চলে যাব। তবে তার আগে রাতের খাওয়াটা সেরে যাব এখানেই।'

ফেন্যা কিন্তু রাতের খাবারের কথা মোটেই ভাবছিল না।

তাড়াতাড়ি করে পাঁচমিশেলী খানাটা সে দিলে হাঁসেদের।

'এই নে তোদের ভিটামিন, এই তোদের লবণ, এই নে ক্যালসিয়ম...'

সবচেয়ে পেট পুরে খাওয়ালে রুগ্ন হাঁসগুলোকে।

'খা, খা! ভালো করে খেলে ফের ধবধবে হয়ে উঠবি, ফুর্তি পাবি, কেউ ঠোকরাতে আসবে না!'

অলক্ষ্যে সন্ধে গড়িয়ে এল।

রাতের খাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা কোর্নেইয়ের হল না, বসে থেকে থেকে উশখুশ করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি চলে গেল।

রাতের খাওয়াটা সেদিন হল দেরিতে, অগ্নিকুণ্ডের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে ঘুমতে গেল না হাঁসেরা, এককেবার চলে যায়, আবার ফিরে আসে খাবারের কাছে—খাবারটা তাদের হয়েছিল ভারি চমৎকার।

যাদু তীরের রাত

খাওয়া সেরেই আরিঙ্কা ঘরে গিয়ে উঠে পড়ল তার ওপরের মাচায়। ধুনির কাছে ঢুলতে লাগল ফেন্যা। লিওন্যা কিন্তু উঠে হাঁটতে লাগল তীর ধরে। বালির ওপর দপদপ করছিল ধুনির লালচে আভা, ছলাৎ ছলাৎ করে উঠছিল সায়রের জলে। ঠিক জলের ওপরেই একটা বাঁকা চাঁদ, আরেকটা চাঁদ তার দিকে চেয়ে ছিল জলের তল থেকে।

হঠাৎ সেই পরিচিত নরম হাসিটা কানে এল লিওন্যার।

'হি-হি-হি! কেমন চলছে?'

'ড়দভোঁ!' খুশি হয়ে উঠল লিওন্যা, 'তুই এসে গেছিস, খুব ভালো হল! তবে চট করে পালাস না। তোর সঙ্গে পরামর্শ আছে।'

বেড়ালের মতো জন্তুটা লাফিয়ে এল লিওন্যার কাছে, আদর কেড়ে গা ঘসতে লাগল তার পায়ের কাছে।

ড়দভোঁ বললে:

'বেশ তো, আলাপ করা যাক। তবে আয় না, তার আগে বালিতে একটু লুকোচুরি খেলি? আজ ভারি ফুর্তি লাগছে আমার! এমন কি কাউকে একটু কামড়ে দেবারও ইচ্ছে হচ্ছে।'

গোলালো মুখখানা উঁচু করে তুলল সে, চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে উঠল তার শাদা-শাদা ধারালো দাঁত।

'তাই বলে আমায় বাপু কামড়ে দিস না,' হেসে উঠল লিওন্যা, 'তা বেশ, লুকোচুরিই খেলা যাক...'

বলে ছড়া কাটলে:

এক-দুই-তিন, চার, পাঁচ
ভোঁদড়টাকে ধরব আজ...

'দূর, দূর!' বাধা দিলে ড়দভোঁ, 'তোর ছড়াটা বাজে। তার চেয়ে আমি বলি:

ভোঁদড়ে মাছ খেল নানা,
মুখেতে আর মাছ রোচে না,
খামার ঘরে ঢুকতে হবে,
অন্য কিছু শুঁকতে হবে,
হাঁসটি খেয়ে মুখটি ধুই,
হাঁদারামটা হলি তুই!'

রাগ হল লিওন্যার:

'কেন, আমি কেন হাঁদারাম হব?'

হি-হি করে হাসল ড়দভোঁ:
'হি-হি-হি! আরে না, আমি বলতে যাচ্ছিলাম:

'চোখবন্ধ থাকবি তুই!'

'যাকগে, আমিই নয় প্রথম চোখ বন্ধ থাকব, তুই আগে লুকোবি,' বলে চোখ বন্ধ করে লিওন্যা গুণতে লাগল, 'এক, দুই, তিন! হয়েছে?'

ড়দভোঁ কোনো সাড়া দিলে না।

তাই ফের গুণতে শুরু করল, এবার জোরে জোরে, 'এক, দুই, তিন! হয়েছে?'

এবারও সাড়া নেই।

লিওন্যা তখন চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলে। কেউ কোথাও নেই। বললে:

'এটা কিন্তু ভারি অন্যায়। এই বললে খেলব, বাস, পালাল। কিন্তু গেল কোথায়?'

চারিদিকে তাকিয়ে দেখল লিওন্যা। সব চুপচাপ। শুধু উঁচু ঢিপিটায় কাগতাড়ুয়া প্রাণপণে তার আস্তিন নাড়াচ্ছে।

'ফের ডাকছে আমাকে,' একটু হাসলে লিওন্যা, 'একলা খারাপ লাগছে? যাচ্ছি যাচ্ছি, কাগতাড়ুয়া! গ্রহ তারার কথা আরেকটু শুনব।'

কাগতাড়ুয়ার দিকে যাচ্ছিল লিওন্যা, এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হল ড়দভোঁ।

'না লিওন্যা, অন্যায়টা আমার নয়, তোরই। তোর খোঁজার পালা, অথচ খুঁজছিস না!' বললে সে, 'তাছাড়া ওই বোকা কাগতাড়ুয়াটার কাছে যাবার কী দরকার পড়ল তোর? না, দেখছি লুকোচুরি খেলতে তুই জানিস না...'

'জানি না মানে?' রেগে উঠল লিওন্যা, 'এক, দুই, তিন গুণে জিজ্ঞেস করলাম: "হয়েছে?" আর তুই সাড়া না দিয়ে লুকিয়ে রইলি। এ তো নিয়ম ভাঙা হল। তুই শুধু পারিস হুট করে এসে হুট করে পালাতে!'

'সেটা আমি খাশা পারি, তাই না?' হেসে উঠল ড়দভোঁ, ফের ঝকঝক করে উঠল তার শাদা শাদা ধারালো দাঁত, 'দেখবি আবার মিলিয়ে যাব?'

'ইচ্ছে হলে যা,' মুখ ভার করে বললে লিওন্যা, 'আমি যাব কাগতাড়ুয়ার কাছে। ওখানেই সময় কাটবে ভালো।'

'আরে না, না! আমার সঙ্গেই তোর ভালো কাটবে। কী বলিস, সায়রটায় যাবি?'

'সায়রটায়? সায়রে যাবি কেমন করে? তোর না জলে খুব ভয়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' চটপট করে সায় দিলে ড়দভোঁ, 'জলে আমি ভয় পাই।'

'তাছাড়া অন্ধকার হয়ে গেছে। আঁধার জলে কীসের মজা?'

'কীসের মজা মানে?' একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে ড়দভোঁ বললে, 'ভয়ানক মজা! জলে আমার ভয় না থাকলে কী করতাম জানিস? ডুব দিয়ে দিয়ে সারা সায়রে যত মাছ, যত বুনো হাঁস, সবাইকে তেড়ে বেড়াতাম... আর ওই হোগলা ঝোপগুলোতে কত পাখি আছে জানিস?... সবকটার বাসা

ভাঙতাম। কী মজা! তুই যা, খুশি করে বেড়াবি, ওরা তোর কিছুই করতে পারবে না! চমৎকার!'

'কী সব কথা বলছিস তুই...' ভুরু কুঁচকে মাথা নেড়ে বললে লিওন্যা, 'মোটেই ভালো লাগছে না আমার। তোকে যেন চিনতেই পারছি না। যাই, হাঁসগুলোকে দেখে আসি।'

ভারি আদুরে আর সোহাগী হয়ে উঠল ড়দভোঁ:

'আর কখনো ওরকম কথা বলব না। কী জানিস, জ্যোৎস্নায় মাথাটা গুলিয়ে গেছে বোধ হয়। চল, আমিও তোর হাঁসগুলোকে দেখে আসি। ভারি ভালেবাসি ওদের!'

'বেশ চল,' বললে লিওন্যা, 'কিন্তু কাগতাড়ুয়া অমন আস্তিন দোলাচ্ছে কেন?'

'বাদ দে, বাদ দে,' বললে ড়দভোঁ, 'মাথার বদলে যার আছে মাত্র পুরনো খবরের কাগজে ঠাসা একটা টুপি, সে আর কাণ্ডজ্ঞানের কথা কীই বা বলবে?'

'তবে ওর বুকটা খুব ভালো। আমাদের এখানে গড়বড় কিছু একটা দেখলে ভারি টনটন করে সেটা।'

'তাতে ফলটা কী? ক্যাঁচকুঁচ ক্যাঁচকুঁচ শুনে শেষ পর্যন্ত লোকের ধৈর্য যাবে। তুলে ফেলে দেবে। কিন্তু কই, হাঁসগুলো কোথায়?'

'ওই যে ওখানে, চালার নিচে ঘুমচ্ছে।'

'চল, আরেকটু কাছিয়ে যাই।'

'না, না, ভয় পেয়ে যাবে। বরং চল ফেন্যার কাছে। এখনো আমায় ও বিশ্বাসই করে না। ভাবে আমি সব বানিয়ে বানিয়ে বলি। চল, তোকে স্বচক্ষে দেখুক।'

ড়দভোঁ এমন কি চমকে পিছিয়েই এল।

'কী বলছিস তুই লিওন্যা! ধুনি জ্বলছে ওখানে আর আমি যে আগুন একেবারে সইতেই পারি না। চল, বরং সায়রে যাই। দেখি তো, দিনের বেলায় কোথায় সাঁতার দেয় হাঁসগুলো।'

সায়রের কাছে এল তারা, যেখানে তারের জালের পার্টিশন দেওয়া আছে জলে।

'এইখানে চরে?' জিজ্ঞেস করল ড়দভোঁ, 'এখান থেকে আর কোথাও যায় না?'

'আর কোথাও যাবার দরকার কী?'

'কেন, নিশ্চয় সারা সায়র জুড়ে চরে বেড়াবার সাধ ওদের হবে বৈকি!'

'ইচ্ছে হয় নিশ্চয়। তবে তাতে লাভ নেই। হোগলা বনে হারিয়ে যেতে পারে। বুনো হয়ে উঠবে। নয়ত ভোঁদড়ের পেটে যাবে।'

'আচ্ছা, এই ঘেরা জায়গাটার কোথাও কোনো ফুটো টুটো নেই রে?' জিজ্ঞেস করলে ড়দভোঁ।

একেবারে জলের কাছে চলে গেল সে, উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। মসৃণ গাটা তার বেঁকে গেল, সামান্য নড়তে লাগল লেজখানা, ছোটো ছোটো থাবার গভীর দাগ গেঁথে গেল বালিতে।

'আছে,' আস্তে করে বললে লিওন্যা, 'আছে একটা ফুটো। ওই দিকে তাকা, দেখতে পাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছি!' ভারি খুসি হয়ে উঠল ড়দভোঁ, গড়াগড়ি দিতে লাগল বালিতে। 'দেখেছি ফুটো। হি-হি-হি!'

‘আস্তে,’ বললে লিওন্যা, ‘হাঁসগুলোর কানে যাবে। ফুটোর কথাটা জেনে ফেলবে...’

‘লিওন্যা!’ ঘুম ভেঙে ডাকলে ফেন্যা, ‘কার সঙ্গে কথা বলছিস তুই?’

লিওন্যার ইচ্ছে হয়েছিল যে বলে, ড়দভোঁ রয়েছে তার সঙ্গে। ড়দভোঁ কিন্তু থাবা তুলে বারণ করলে:

‘আমার কথা কিছু বলবি নে! বড়োদের আমার পছন্দ হয় না! তার চেয়ে বরং আরিঙকাকে নিয়ে তুই কাল আমার ওখানে বেড়াতে আসিস। কেমন? নিশ্চয় আসবি কিন্তু! আমি পথ চেয়ে থাকব! তোদের আমার গর্তটাও দেখাব! ঠিক আছে?’

‘ঠিক আছে,’ জবাব দিলে লিওন্যা।

তবে জবাবটা হল একেবারে ফাঁকা অন্ধকারে—ড়দভোঁ ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে।

‘ঘুমতে যা লিওন্যা,’ বললে ফেন্যা, ‘দেখছি, হাঁটতে হাঁটতেই ঘুমোচ্ছিস আর ঘুমের ঘোরে নিজের মনেই কথা কইছিস। আমি এমন খাশা ঝিমিয়ে নিয়েছি যে ভোর পর্যন্ত ঘুম আসবে না। তবে ভোরেরও আর দেরি নেই, ফরসা হয়ে আসছে।’

ড়দভোঁর কথাটা ওকে শোনাবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল লিওন্যার। কিন্তু কী লাভ? ফেন্যা তো বিশ্বাসই করবে না।

হাই তুলে ঘুমতে গেল সে।

ড়দভোঁ’র চরে

ভোরের দিকে উষ্ণ ধারায় অঝোরে বৃষ্টি নামল। ঘুমের মধ্যেই লিওন্যার কানে যাচ্ছিল টিনের চালের ওপর বড়ো বড়ো ফোঁটার ঝমঝম আওয়াজ।

সকালে জলে ভেজা রোদের চমকটা হল আরো উচ্ছল, আরো মিঠে। সায়রের জল স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তলা পর্যন্ত। হোগলা, বালি, শ্যাওলা, মাছ, সবই দেখা যায়।

কাল ড়দভোঁ বলেছিল: ‘চল, সায়রে বেড়াই।’

কিন্তু রাত্রে, অন্ধকার জলে সায়রে নামবে কে? এখন হলে লিওন্যা যেত, সায়রের আলো-আলো তলাটা দিয়ে হাঁটতে রাজী সে। আরিঙকাকে ডাকতে হয়।

‘আরিঙকা, কোথায় তুই?’

সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল আরিঙকা।

‘কাগতাড়ুয়ার কাছে গিয়েছিলাম। ওর কথা আমরা একেবারে ভুলেই গেছি।’

‘হ্যাঁ,’ বললে লিওন্যা, ‘কাল আমায় আস্তিন নেড়ে অনেক ডেকেছিল।’

‘আর তুই যাস নি?’

‘না, যাই নি। ড়দভোঁ ছিল আমার সঙ্গে। তুই তখন ঘুমোচ্ছিলি।’

‘ঈস, কী আপসোস! আমায় ডাকলি না কেন? তোকে কিছু বললে ও?’

‘কিছু না, খেললাম খানিকটা। তারপর নেমন্তন্ন করলে যেতে।’

আনন্দে লাফিয়ে উঠল আরিঙকা:

'নেমন্তন্ন করলে? যাবি?'

'নিশ্চয় যাব। কিন্তু কাগতাড়ুয়া কী বললে তোকে?'

ঘাড় নাড়লে আরিঙকা:

'কেন জানি কিছুই বললে না। এমন কি ক্যাঁচকুঁচও করলে না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেললে। আমার কেমন অভিমানই হল। কত কথা বললাম, আর ও চুপ করেই রইল। যেন সাধারণ একটা অ্যাসপেন গাছের গোঁজ।'

'অ্যাসপেন নয়, পপলার।'

'যদি চুপ করেই থাকে, তাহলে যে গাছেরই গোঁজ হোক, বয়েই গেল।'

লিওন্যা কাগতাড়ুয়ার দিকে চেয়ে দেখল। এতটুকু নড়ছে না সে। রোদ্দুরটা অমন মিঠে হওয়ায় ভারি যেন সে খুশি। তাকে দেখে বসন্তের গাছগুলোর কথা মনে হল লিওন্যার। ঠিক ওই গোঁজটার মতোই তারা তখনো ন্যাড়া, পাতা ঝরা, কিন্তু সূর্যের তাপে খুশি, যেন কান পেতে শুনছে তার ডালে ডালে প্রাণরসের সঞ্চার।

'ঈস, ভারি বুদ্ধি,' নিজের মনেই বলে উঠল লিওন্যা, 'কোথায় একটা ন্যাড়া গোঁজ আর কোথায় তাজা গাছ!'

'কিন্তু ড়দভোঁর কাছে যাব কখন?' জিজ্ঞেস করলে আরিঙকা।

'দুপুরে,' বললে লিওন্যা, 'হাঁসগুলোকে খাইয়েই চলে যাব।'

আনন্দে কুঁইকুঁই করে উঠল আরিঙকা:

'ওহ্ কী মজা! তবে জানিস, একটু সাজগোজ করা দরকার। কেউ বাড়িতে ডাকলে সাজগোজ করতে হয়।'

'করগে সাজগোজ,' বললে লিওন্যা, 'কিন্তু করবি কী দিয়ে?'

'তুইও করবি,' বললে আরিঙকা, 'আর কী দিয়ে করব সেটা পরে দেখিস।'

দুপুরে হাঁস খাওয়ানো হল। এর মধ্যেই প্রায় সুস্থ হয়ে গেছে সবাই, কামড়াকামড়ি করছে না, ঝগড়াঝাঁটি নেই। যেগুলোকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল, সেগুলো ফের হয়ে উঠেছে হাসিখুশি, শান্ত, দুধের মতো শাদা।

নৌকো খুলতে গেল লিওন্যা।

আরিঙকা চেঁচিয়ে বললে:

'একটু দাঁড়া। সাজ পোষাক নিয়ে আসছি!'

বলে ছুটে গেল ঝোপের দিকে।

লিওন্যা ভাবল, ওখানে আবার কীসের পোষাক? কী পাবে ওখানে?

'এই দ্যাখ কেমন সাজ!' বললে আরিঙকা।

বন থেকে এক রাশ ফুল এনেছিল সে—বেগুনী ঘণ্টিফুল, হলদে ঘাসফুল, লালচে বনফুল।

লাল আর নীল ফুলগুলো দিয়ে তারা বানালে মাথার মুকুট, আর হলদে ফুলগুলো দিয়ে গাঁথল গলার মালা। ভারি সুন্দর দেখাল তাদের।

'কী মনে হয় তোর, ড়দভোঁ আমাদের দেখে খুশি হবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করলে আরিংকা।

'খুশি হবে বৈকি,' বললে লিওন্যা, 'ও নিজেই তো আমাদের বার বার করে আসতে বললে!'

নৌকোয় উঠে জলে ভাসল দুজনে। এমন আনন্দ হচ্ছিল ওদের যেন কোনো পরব শুরু হয়েছে। তীরে নামতেই চেনা গাছপালাগুলো নিশ্চয় ভারি খুশি হয়ে উঠবে ওদের দেখে, গুঞ্জন করে উঠবে: 'এসো, এসো গো, এসো! ভারি আনন্দ হল, কদ্দিন এখানে আসো নি!' তারপর ড়দভোঁর সঙ্গে দেখা হবে, সেও খুশি হবে, বলবে: 'চল, আমার গর্তে যাই, তোদের বৈঁচি খাওয়াব।'

নৌকো এসে তীরে ভিড়ল, কিন্তু কাউকে খুশি হতে দেখা গেল না। গাছগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। চরে যে অতিথি এসেছে, সেটা তারা চেয়েও দেখল না। চেয়ে দেখার ইচ্ছেই নেই ওদের। ঝোপঝাড়গুলোও খুশি হল না মোটে, স্রেফ তারা হাতপা গুটিয়ে কোন দিকে যেন তাকিয়ে রইল।

হোগলারাও চোখ ফিরিয়ে নিলে। জলের দিকে এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন নিজেদের ছায়া দেখছে এই প্রথম।

'নমস্কার,' জোর গলায় বললে লিওন্যা।

'নমস্কার করতে এসো না আমাদের,' বললে ঝোপগুলো। গাছ আর হোগলারা স্রেফ চুপ করে রইল।

'কী হল?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা, 'সবাই এত চটে আছ কেন? আমি তো তোমাদের ডালপালাও ভাঙি নি, ধুনিও জ্বালাই নি। পাখির বাসাও তছনছ করি নি কিছু।'

'হাস-সালে বটে!' পাতা খসখসিয়ে বলে উঠল বাদামগাছ, 'তুই না করিস-স, তোর স-স্যাঙাৎ তছনছ করেছে!'

অবাক হয়ে গেল লিওন্যা:

'আমার স্যাঙাৎ? আমার আবার স্যাঙাৎ কোথায়?'

আরিংকারও রাগ হল:

'কোন স্যাঙাৎ? নাকি বলতে চাও সেটা আমি? এ্যাঁ?'

'বটে! কোন স-স্যাঙাৎ তা নাকি ও জানে না!' গুঞ্জন উঠল চারিদিক থেকে, 'শু-শুনলে কথা, ও নাকি জানে না!'

'পাজির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিজে ভালো থাকবি লিওন্যা,' ঝিরঝিরিয়ে উঠল বুড়ো ওকগাছ, 'স-সত্যিই তাই ভাবিস-স নাকি?'

'ভালো লোক কখনো পাজীর স্যাঙাৎ হতে পারে না,' তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে উঠল অ্যাশগাছ, 'পারে না, পারে না!'

'কিন্তু সেই পাজীটা কে?' জিজ্ঞেস করল লিওন্যা, 'কে আমার স্যাঙাৎ?'

'শোনো কথা, ও নাকি জানে না, জানে না!'

'স্যাঙাৎ তোর, ভোঁদড়-ড়!' সমস্ত কাঁটা খড়খড় করে বললে ফারগাছ, 'কেন, জানিস না?'

'ভোঁদড়!' চেঁচিয়ে উঠল লিওন্যা, 'ভোঁদড় আমার বন্ধু?'

'শোনো কথা, ও তা জানে না, ও নাকি জানে না! শোনো একবার! ও জানে না!'

'হ্যাঁ, ভোঁদড়,' বললে ফারগাছ, 'তুই ওর তল্লাশ করবি বলেছিলি, কথা দিয়েছিলি ওকে ধরবি, আর নিজেই বন্ধুত্ব পাতিয়েছিস!'

'মিথ্যে কথা!' বললে লিওন্যা, 'আমি ওকে চোখেই দেখি নি!'

'একেবারে মিথ্যে কথা!' আরিঙকাও পুনরুক্তি করলে, 'আমরা নিজেরাই ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, শুধু পাত্তা পাচ্ছি না!'

'ওরা নাকি ওকে দেখেই নি!' কলরব উঠল চারিদিক থেকে, 'শুনলে তো, ওরা নাকি ওকে দেখেই নি! কী মিথ্যেই না বলতে পারে!'

'আদপেই হয়ত ভোঁদড় ফোঁদড় কিছু নেই?' কড়া গলায় সড়সড়িয়ে উঠল হোগলারা, 'তাহলে আমার ঝোপে এই পাখির বাসাটা ভাঙলে কে? কে মারলে পাখির ছানা। মাছগুলোকে খুবলে তীরে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে কে?'

'চল, আরিঙকা যাই,' বললে লিওন্যা, 'কী যে বলছে মাথামুণ্ডু বোঝা দায়!'

ভারি অভিমান হল লিওন্যার। ভোঁদড় তার দু'চোখের বিষ, নিজেই সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। চরে সে এসেছেই তো এই জন্যে যে ড়দভোঁর সঙ্গে মিলে তার গর্তটা আবিষ্কার করবে। আর এরা কিনা গাল দিচ্ছে তাকেই!

তীর ধরে চলল ওরা দু'জন। আর যত এগোয় ততই ওদের বুক মুচড়ে আসে। থেকে থেকেই চোখে পড়ছিল মাছ পড়ে আছে আধকামড়ানো। রুপোলী সরপুঁটি, লালচে রুই, কাতলা। সবারই পিঠের দিকটা খুবলে খাওয়া। এতটুকু মায়া দয়া না করে পাজীটা পাষণ্ডের মতো প্রাণ নিয়েছে।

ঝোপঝাড়ের নিচে ঘাসের ওপর পড়ে আছে শাদা শাদা পালক। তার মানে পাখিও বাদ দেয় নি।

'কী বিছছিরি লাগছে...' ফিসফিস করলে আরিঙকা, 'মুচড়ে আসছে বুক!'

'কিন্তু ড়দভোঁটা এখনো দেখা দিচ্ছে না কেন?' বললে লিওন্যা, 'বলেছিল থাকবে। ওকে পেলেই জিজ্ঞেস করব, ভোঁদড়টাকে কি সত্যিই একবারও দেখে নি?'

'ভোঁদড় হয়ত ওকেও খেয়ে ফেলেছে?'

আরিঙকার দিকে তাকাল লিওন্যা:

'হয়ত তুই ঠিকই বলেছিস?'

চিৎকার করে ওরা ড়দভোঁকে ডাকতে লাগল।

'ড়দভোঁ, কোথায় তুই? আমরা তোর কাছে বেড়াতে এসেছি! কোথায় তুই? দেখা দে!'

কিন্তু গোটা চর কেমন চুপচাপ, মনমরা। কেউ সাড়া দিলে না ডাকে। আরিঙ্কা কেঁদে ফেললে:

'লিওন্যা, চল, তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই! ভয় করছে আমার!'

মাথা থেকে মুকুট আর গলার হার খুলে মাটিতে ছুড়ে ফেললে লিওন্যা।

'চল যাই।'

দ্রুত পা চালিয়ে ওরা ফিরে চলল নৌকোর কাছে। ভারি কষ্ট হচ্ছিল যেতে। কাঁটা কাঁটা ডালপালায় জড়িয়ে যাচ্ছিল পা, মাটি ফুঁড়ে খোঁচা দিচ্ছিল শিকড়, হাতে পায়ে কামড় লাগাচ্ছিল বিছুটি।

ভয়ে আর যন্ত্রণায় আরিঙ্কা কাঁদো-কাঁদো।

লিওন্যা বললে:

'কাঁদিস না আরিঙ্কা, এই তো নৌকো।'

নৌকোয় লাফিয়ে উঠল আরিঙ্কা। আর ঠিক সেই সময় তীরের উইলোগাছটা নিচু হয়ে ওর ফুলের মুকুটটি তুলে নিলে মাথা থেকে।

'আমাদের এরা দু'চোখে দেখতে পারে না!' কেঁদে ফেললে আরিঙ্কা, 'আর আমরা কিনা এসেছিলাম এদের কাছে বেড়াতে!'

লিওন্যা চুপ করে রইল। তাড়াতাড়ি করে বৈঠা বাইছিল সে। ভারি কষ্ট হচ্ছিল তার। কী করে এরা ভাবতে পারল যে সে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে ভোঁদড়ের সঙ্গে? ও তো ভারি মিষ্টি ফুর্তিবাজ এক প্রাণী ড়দভোঁর বন্ধু। ড়দভোঁ কি কখনো ভোঁদড়ের মতো দেখতে?

ড়দভোঁও আচ্ছা! নেমন্তন্ন করে কোথায় লুকিয়ে আছে!

কিন্তু সত্যিই লুকিয়ে আছে কি? হয়ত সত্যিই ভোঁদড় ওকে চিবিয়ে খেয়েছে?

চুপচাপ নৌকো বেয়ে চলল ওরা। চুপচাপ তীরে নেমে নৌকো বেঁধে রাখলে।

হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল।

'লিওন্যা, আরিঙ্কা!' প্রাণপণে চিৎকার করছিল ফেন্যা, 'কোথায় গেছলি তোরা? শিগগির! ভোঁদড়ে হাঁস ধরেছে!'

কাহিনীর শেষ

ব্যাপারটা হয়েছিল এই। ঘরের কাছে বসে রাতের খাবারের জন্যে নিশ্চিন্তে আলু ছাড়াচ্ছিল ফেন্যা। নিশ্চিন্তে ছায়ায় শুয়ে খাবারের অপেক্ষা করছিল কোর্নেই। নিশ্চিন্তে সাঁতার দিচ্ছিল হাঁসগুলো, দুলছিল ছোটো ছোটো ঢেউয়ের দোলায়। জলের দিকে তাকিয়ে ছিল সূর্য। ঢিপির ওপর নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল কাগতাড়ুয়া, হয়ত ঝিমুচ্ছিল, হয়ত বা ভাবছিল কিছু একটা...

হঠাৎ আস্তিন দোলাতে শুরু করলে কাগতাড়ুয়া। মনে হল যেন এক্ষুণি সে ঢিপি ছেড়ে উপড়ে আসবে, চ্যাঁচাবে, কিছু না কিছু করবে।

ফেন্যা ভাবলে, একেবারে যেন সত্যিকারের মানুষ। কিন্তু কেমন-কেমন। বাতাস নেই, অথচ কাগতাড়ুয়ার আস্তিন দুলছে। নাকি হয়ত বাতাস বইছে টিপিটার ওখানে?

হঠাৎ প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠল হাঁসগুলো। লাফিয়ে উঠে ফেন্যা ছুটল জলের দিকে।

'কী ব্যাপার? হল-টা কী?'

মরীয়া হয়ে চ্যাঁচাচ্ছিল হাঁসগুলো, ঠেলাঠেলি করে, ডানা ঝটপটিয়ে সবাই ছুটে আসতে চাইছিল ফেন্যার দিকে। দল বেঁধে তারা ছুটল তীরমুখো। শুধু একটা হাঁস জলে রয়ে গেল। ঝটপট করে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছিল সেটা, কিন্তু নড়তে পারল না। অদৃশ্য কেউ যেন তাকে আটকে রেখেছে।

ফেন্যা টের পেলে, নিশ্চয় ভোঁদড়ে ওর ঠ্যাং চেপে ধরেছে। যেমন ছিল ওভারকোট গায়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। জলের নিচে তলিয়ে গেল হাঁস, আর তাকে উঠতে দেখা গেল না। শুধু চোখে পড়ল ভোঁদড়ে হাঁসের পা চেপে ধরে গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

'আমিও ভোঁদড়টাকে দেখেছি,' বললে কোর্নেই, 'লম্বা মতো।'

'তারের বেড়ায় ফুটো আছে ধরলে কী করে?' গাল থেকে চোখের জল মুছে বললে ফেন্যা, 'কী শয়তান! জলে ডুব দিয়েই সোজা ফুটোটার দিকে! আর কী ঠেকানো যায়! কী সুন্দর মিষ্টি হাঁসটাকে নিয়ে গেল!'

'এবার ঘনঘন হানা দেবে,' বললে আরিঙ্কা, 'পথ পেয়ে গেছে তো।'

লিওন্যা কিন্তু ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। ভাবছিল, ফুটোটার কথা ভোঁদড় জানলে কী করে? কাল যখন আমরা তীরে ড়দভোঁর সঙ্গে খেলছিলাম, তখন কাছাকাছি কোথাও ছিল নাকি? হয়ত ড়দভোঁকে যখন ফুটোটার কথা বলছিলাম তখন তার কানে গেছে?

ভেজা ওভারকোটটা খুলে একটা পুরনো ড্রেসিং গাউন পরলে ফেন্যা। চোখের জল মুছে বললে:

'নে, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ব্রিগেডিয়ারের কাছে ছুটে যা তো। এক্ষুণি যেন বন্দুক সমেত শিকারী পাঠায়, এক্ষুণি এসে ভোঁদড়টাকে ধরুক। আর একদিনও যাতে না বাঁচে!'

লিওন্যা আর আরিঙ্কা কোনো কথা না বলেই ছুটল রাষ্ট্রীয় খামারে। কোর্নেই ফের তার জায়গাটিতে শুয়ে পড়ল।

'আমি আগেই জানতাম যে ভোঁদড়ে হাঁস ধরবে,' বললে কোর্নেই, 'মাছ যখন মারছে, তখন হাঁস মারতেও শুরু করবে। আগেই ওকে ধরা দরকার ছিল।'

'ধরলেই পারতিস, বসে রইলি কেন?' বললে ফেন্যা।

'ভেবেছিলাম, হাঁস হয়ত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসবে।'

'দেখছি বড়ো বেশি তুই ভাবিস,' সখেদে বললে ফেন্যা, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তুই অতিবুদ্ধিমান কোর্নেই।'

'তা হাঁদা তো নই,' সায় দিলে কোর্নেই এবং পাশ ফিরে শ্বল।

বোঝাই যাচ্ছে রাতের খাওয়াটা আজ চট করে হবার নয়, তাই খানিকটা গড়িয়ে নেওয়া ভালো।

জলের দিকে স্বর্যের তাকিয়ে থাকা সাঙ্গ হল, সমস্ত তার হল্বদ কিরণ গ্বটিয়ে নিয়ে সে এসে নামল চরের সেই গাছগ্বলোর মাথায়।

এই সময় রাষ্ট্রীয় খামার থেকে ফিরে এল লিওন্যা আর আরিঙ্কা। ব্রিগেডিয়ারও আছে তাদের সঙ্গে।

'শিকারী কই?' জিজ্ঞেস করলে ফেন্যা, 'বন্দ্বকই বা কোথায়?'

'শিকারীর ভরসায় থেকে লাভ নেই। আমিই শিকারী, বন্দ্বক দরকার হবে না। এই হল আমার হাতিয়ার,' বলে কাঁধের ঝোলাটা থেকে ব্রিগেডিয়ার বার করলে একটা ফাঁদ।

'কিন্তু ফাঁদে পড়বে তো?' জিজ্ঞেস করলে ফেন্যা, 'ভারি ধ্বর্ত কিন্তু!'

'আমরা আরো চালাক,' বললে ব্রিগেডিয়ার, 'দেখি কে কাকে চালাকিতে হারায়।'

তক্ষ্বণি সে নৌকো নিয়ে চলে গেল চরে। লিওন্যা, আরিঙ্কা আর কোর্নেইও সঙ্গে যেতে চাইছিল, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার নিলে না। বললে যে হৈচৈ করে ওরা ভোঁদড়কে ভয় পাইয়ে দেবে।

'মিছেই আমায় সঙ্গে নিলে না!' বলে মাথা চুলকাল কোর্নেই, 'ঠিক ফাঁদ পেতে দিতাম, আমার কাছ থেকে ওকে পালাতে হত না।'

আরিঙ্কা বললে:

'তোর নাকের ডগা থেকে হাঁস নিয়ে গেল, আর বলে কিনা পালাতে হত না। ম্বখ ব্বজে থাক!'

'তবে কি জলে ঝাঁপাব? হাঁদা তো আর নই... শার্টটা আমার নতুন, রঙ চটে যেতে পারত।'

'দ্বনিয়ায় তুই বেঁচে আছিস কীসের জন্যে বল তো?' জিজ্ঞেস করলে আরিঙ্কা, 'নে, বল।'

'কীসের জন্যে?' একটু ভাবতে লাগল কোর্নেই।

তারপর ফেন্যা গেল হাঁস খাওয়াতে। লিওন্যা, আরিঙ্কাও গেল সাহায্য করতে। আর কোর্নেই শ্বয়ে শ্বয়ে ভাবতে লাগল, ব্বঝতে চাইল কেন সে দ্বনিয়ায় বেঁচে আছে।

কাজ সেরে লিওন্যা আর আরিঙ্কা গেল কাগতাড়্বয়াকে দেখতে। দ্বর থেকেই আস্তিন নাড়াচ্ছিল কাগতাড়্বয়া।

'অনেক কাল তোমাদের দেখি নি,' কেমন নরম, ভেজাভেজা স্বরে ক্যাঁচক্যাঁচ করলে কাগতাড়্বয়া, 'তোমরা এসেছ দেখে ভারি আনন্দ হল!'

'কথা বলছে রে,' অবাক হয়ে গেল আরিঙ্কা, 'আর আমি যখন এসেছিলাম তখন চুপ করে ছিলে কেন?'

'আরে আরিঙ্কা, কী আর বলি? নিজেই আমি জানি না আমার কী হচ্ছে। বৃষ্টি দেখে আকুল হয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ টের পেলাম ভেজা মাটি... কী সব কথা মনে খেলতে লাগল... মনে হল কবে যেন আমি ছিলাম গাছ...'

'বটেই তো, গাছ ছিলে বৈকি,' বললে লিওন্যা, 'তুমি ছিলে একটা কচি পপলার গাছ, দাঁড়িয়ে থাকতে ঠিক রাস্তার কাছটিতে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকতাম ঠিক রাস্তার ধারে। সবাই আসত যেত আমার সামনে দিয়ে। ভারি সুন্দর দিন ছিল!'

'আর যদি বনে থাকতে তাহলে তো কেউ তোমায় কাটত না,' বললে আরিঙ্কা, 'তোমাকে দিয়ে কাগতাড়ুয়াও বানাত না কেউ।'

'তবে যদি কিছু উপকার হয় তাহলে কাগতাড়ুয়া হওয়াও তেমন খারাপ কিছু নয়...' আপত্তি করলে কাগতাড়ুয়া, 'আর দেখ না, আজকে আমি কোনো উপকারই করতে পারলাম না। ভোঁদড়টা যে আসছে তা আমি দেখেছিলাম, কত ক্যাঁচক্যাঁচ করলাম, আস্তিন দোলালাম! হুঁশিয়ারি দেবার কত চেষ্টা করলাম! কিন্তু কেউ কি শুনলে? এই হয় সর্বদাই: আস্তিন দোলালি, বাস, ওই শেষ। তাই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন খারাপ করে লাভ আছে কিছু?'

'আমরাই বা কেন চরে গেলাম!' বললে আরিঙ্কা, 'না হলে হয়ত হাঁসটাকে বাঁচানো যেত।'

'নিশ্চয় বাঁচানো যেত,' বললে লিওন্যা, 'আমি একেবারে তল পর্যন্ত ডুব দিয়ে ছিনিয়ে আনতাম হাঁসটাকে! কত কান্নাকাটি করে আমাদের ডাকছিল সে...'

'হ্যাঁ, খুব ডাকাডাকি করেছিল,' সখেদে ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল কাগতাড়ুয়া, 'এমন ডাকছিল যে আমার বুক হিম হয়ে যাচ্ছিল। অথচ তার একটু আগেই কেমন যেন মনে হচ্ছিল যে আমার গায়ে বুঝি প্রাণরসের আমেজ পাচ্ছি!.. হুঁ! মনে হচ্ছিল যেন আবার গাছ হয়ে উঠব... এমন আনন্দ লাগছিল যে মনে হচ্ছিল যেন আমার শিকড় বেরুচ্ছে! কিন্তু এমন চেঁচাচ্ছিল হাঁসটা যে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। মনে হতে পারে, চ্যাঁচাচ্ছে, আমার তাতে বয়েই গেল। ভোঁদড় তো আর আমায় কামড়ায় নি। কিন্তু দ্যাখো দিকি, চোখের সামনে কারো একটা বিপদ দেখলে সব আনন্দ কোথায় উড়ে যায়, অসাড় হয়ে যায় গা...'

বিষণ্ণ কাগতাড়ুয়ার সঙ্গে এইভাবেই বসে বসে আলাপ করলে লিওন্যা আর আরিঙ্কা। নিজেদেরও তাদের মন ভার। তাছাড়া একথা ভেবেও লিওন্যার ভারি কষ্ট হচ্ছিল যে নিজেই সে ফুটোটার কথা বলেছিল, পাজী ভোঁদড়ের কানে গেছে তা।

তারপর ফিরে এল ব্রিগাডিয়ার, ফেন্যা তাকে খেতে ডাকলে।

খাওয়ার বন্দোবস্তটা ভালোই হয়েছিল, কিন্তু মনে কারো আনন্দ নেই।

ফেন্যা বললে:

'ফাঁদে ও পড়বে না, খাবার ওর চারিদিকে কত চাই, কোন সাধে ফাঁদে ঢুকবে?'

'ফাঁদে ঢুকবে লোভের তাড়ায়,' বললে ব্রিগাডিয়ার, 'এত লোভী যে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

তারপর বাড়ি চলে গেল ব্রিগাডিয়ার। বললে, ভোরে এসে ফাঁদ দেখবে। কোর্নেই গেল তার সঙ্গে। তখনও সে ভাবছিল, সত্যি কেন সে দুনিয়ায় বেঁচে আছে, এটা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। এই না-ফয়সালা প্রশ্ন নিয়েই বাড়ি গেল সে আর সেই সঙ্গে বিদায় নিলে আমাদের বই থেকে।

সারা রাত ফেন্যা পায়চারি করে ঝেড়াল তীরে, হাঁসগুলোকে পাহারা দিলে। মাঝে মাঝে ধুনির কাছে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। তারপর ভোর হতেই ধুনি নিবিয়ে হাঁসগুলোকে খাওয়াতে লাগল, কোথাও আর নড়ল না। লিওন্যা আর আরিঙকার ঘুম এল না অনেকক্ষণ, কান পেতে ছিল তারা, কেবলি মনে হচ্ছিল ওই বুঝি ভোঁদড় আসছে। তারপর কখন নিজেরাই যে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায় নি।

ভোরে লিওন্যার ঘুম ভাঙল ব্রিগেডিয়ার গলার স্বর শুনতে পেয়ে।

'ব্রিগেডিয়ার এসেছে!' চেঁচিয়ে সে বললে আরিঙকাকে, তারপর ছুটে বেরল ঘর থেকে। 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব কমরেড ব্রিগেডিয়ার,' বললে সে, 'আপনার সঙ্গে চরে।'

'আমি একাই পারব রে,' বললে ব্রিগেডিয়ার।

এই সময় বেরিয়ে এল আরিঙকা।

'না বাবা, তোমার সঙ্গে আমরা যাবই যাব! তোমায় সাহায্য করব!'

'যাবই যাব আমরা!' পুনরুক্তি করলে লিওন্যা।

'তাহলে নৌকো খোল,' বললে ব্রিগেডিয়ার। ঝোলাটা তুলে নিল কাঁধে, ঝোলায় পুরলে দড়ি।

এবার ব্রিগেডিয়ার সঙ্গে থাকায় চরে যেতে একটুও ভয় করল না লিওন্যা আর আরিঙকার। কত বড়ো আমাদের ব্রিগেডিয়ার, গায়ে কত জোর। দেখি এবার কে আমাদের মন্দ কথা বলে!

চরে সত্যি কেউ তাদের ওপর চোটপাট করলে না। যেন লক্ষই করলে না কেউ। গাছগুলো মাথা বাড়িয়ে রইল আকাশে, চুপ করে রইল ঝোপঝাড়, হোগলাগুলো জলের ওপর ঝিমুচ্ছিল আর কিচির-মিচির করে কী সব গান গাইছিল পাখিরা। লিওন্যা আর আরিঙকার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই যেন তাদের নেই।

অনেকক্ষণ তীর ধরে হাঁটল তারা। ব্রিগেডিয়ার সামনে, লিওন্যা আর আরিঙকা তার পেছু পেছু।

'ড়দভোঁ একেবারে আসাই ছেড়ে দিলে কেন বল তো?' কী যেন ভাবতে ভাবতে বললে আরিঙকা।

'হ্যাঁ একেবারে আসছে না,' বললে লিওন্যা, 'এখান থেকে চলেই গেল... নাকি...'

'নাকি ভোঁদড়েই খেলে।'

বলে দুজনেই চুপ করে গেল।

'লিওন্যা,' ফের বললে আরিঙকা, 'ভোঁদড় ওকে খেলে ভারি খারাপ হবে। এমন কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে, ভারি মিষ্টি জন্তু! ডেকে দেখ না। হয়ত সাড়া দেবে, এমন পিউপিউ করত, হাসত!..'

‘ড়দভোঁ!’ ডাকলে লিওন্যা, ‘দেখা দে ড়দভোঁ!’

‘অন্তত এক মিনিটের জন্যে আয়!’ ডাকলে আরিঙ্কা, ‘এক মিনিট! মন কেমন করছে তোর জন্যে!..’

ব্রিগেডিয়ার বললে:

‘এই দ্যাখ ওর গর্ত, এইখান থেকেই জলে ঢোকার পথ।’

‘কোথায় গর্ত? ভোঁদড়ের গর্ত?’

গোল মতো গর্তটার দিকে চেয়ে দেখলে লিওন্যা আর আরিঙ্কা। গর্তটা অন্ধকার, গাছের শিকড়গুলোর তলে অনেকটা নিচে নেমে গেছে তা।

সায়রের দিকে ফিরলে ব্রিগেডিয়ার। লিওন্যা আর আরিঙ্কাও তার পিছে পিছে। যাওয়া কঠিন হচ্ছিল। ঘাসপাতা ঝোপঝাড়ে আটকে যাচ্ছিল পা। তবে তীরটা দূরে নয়, জল দেখা যাচ্ছিল ডালপালার মধ্যে দিয়ে।

‘এবার দেখা যাবে ভোঁদড়ের কোনটা বেশি: বুদ্ধি নাকি লোভ?’ বলে জলের কাছে নেমে গেল ব্রিগেডিয়ার।

‘কী?’ লিওন্যার বুক অসাড় হয়ে এল, ‘কী পেলেন?’

‘হুম,’ হাসল ব্রিগেডিয়ার, ‘যা বলেছিলাম—লোভ!’

‘ফাঁদে পড়েছে?’

‘পড়েছে!’

লিওন্যা আর আরিঙ্কা স্রেফ ছুটে নামল জলে। জায়গাটা গভীর নয়, কিন্তু কী সব শ্যাওলা আর পানায় জল কেমন সবুজ।

এইখানে ফাঁদটা দেখল ওরা। আর ফাঁদের মধ্যে...

‘ড়দভোঁ!’ চেঁচিয়ে উঠল লিওন্যা, ‘কমরেড ব্রিগেডিয়ার, এ কী করেছেন আপনি! আমাদের ড়দভোঁকে ধরেছেন যে!’

‘আমাদের ড়দভোঁ!’ চেঁচিয়ে উঠল আরিঙ্কা, ‘আমাদের মিষ্টি সোহাগী ড়দভোঁ!’

‘ড়দভোঁ?’ হেসে উঠল ব্রিগেডিয়ার, ‘এ নাম ওকে কে দিলে?’

‘ও যে নিজেই বললে। ওর নাম ড়দভোঁ। শীগগির ওকে ছেড়ে দিন!’

‘ছেড়ে দাও বাবা!’ মিনতি করলে আরিঙ্কা, ‘শীগগির!’

জলের তল থেকে করুণ চোখে চাইছিল ড়দভোঁ। থাবাগুলো ওর জাঁতি-কলে আটকানো।

‘ড়দভোঁ?’ ফের জিজ্ঞেস করলে ব্রিগেডিয়ার, ‘তা ড়দভোঁই বটে। আয় তো লিওন্যা, বালির ওপর ওর নামটা লেখ তো।’

‘কেন বলুন তো?’ জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা। তাহলেও তীরে উঠে একটা কাঠি দিয়ে বালির ওপর লিখলে ‘ড়দভোঁ’।

‘এবার লেখাটা উল্টো দিক থেকে পড় তো,’ বললে ব্রিগেডিয়ার, ‘নে, জোরে জোরে পড়।’

লিওন্যা পড়লে:

'ভোঁদড়।'

'কী বললি?' চেঁচিয়ে উঠল আরিঙ্কা, 'কোথায় ভোঁদড়? কীসের ভোঁদড়? তুই পড়তেও পারিস না!'

লাফিয়ে তীরে উঠে সে নিজেই পড়লে। তারও বেলায় দাঁড়াল একই।

'ড়দভোঁ, ভোঁদড়... ভোঁদড়!' বললে আরিঙ্কা, 'তার মানে তুই ভোঁদড়! তুই সেই ভোঁদড়!'

বলে রাগে অভিমানে ডুকরে কেঁদে উঠল আরিঙ্কা।

'ভোঁদড়,' বললে লিওন্যা, 'আর আমি কিনা তোকে ছেড়ে দিতে চাইছিলাম! কত ভালোবাসতাম তোকে... চোর, পাজী, বুজরুক কোথাকার!'

হ্যাঁ, সত্যিই ওটা ভোঁদড়। আদুরে আদুরে ভাব সে আর তখন করছিল না। হিসিয়ে উঠছিল, গর্জে উঠছিল, শাদা শাদা ধারালো দাঁতে কামড়াচ্ছিল জাঁতি-কলটা, আর এমন আক্রোশে চাইছিল যে মনে হল এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে সবার ওপর, কামড়ে কুটিকুটি করবে! ব্রিগেডিয়ার ভোঁদড়কে ঝোলায় পুরে শক্ত করে বাঁধলে দড়ি দিয়ে। বললে:

'ব্যাস, আমাদের সায়রে আর ডাকাতির ভয় নেই।'

খুশি হয়েই হাঁটছিল সে, এমন কি গানও গাইছিল গুনগুনিয়ে। লিওন্যা আর আরিঙ্কা কিন্তু চুপ করে রইল।

লিওন্যা ভাবছিল, পাজী ভোঁদড়টা ধরা পড়েছে, ভালোই হয়েছে! কিন্তু আমি ওকে চিনতে পারলাম না কেন? কেন মাথায় খেলল না?

আর আরিঙ্কা ভাবছিল, পাজী ভোঁদড়টা ধরা পড়েছে, বেশ হয়েছে! হাঁস চুরি করবে না আর, মাছ মারবে না। সব চেয়ে বড়ো কথা, অমন আদুরে ভান করবে না। মিছিমিছি ভালোবাসা কাড়বে না লোকের!

ভোঁদড় ধরা পড়েছে শুনে ভারি খুশি হয়ে উঠল ফেন্যা। এতই খুশি হয়ে উঠল যে লিওন্যা আর আরিঙ্কার মনমরা ভাবটাও কেটে গেল।

ব্রিগেডিয়ার ভোঁদড় ভরা ঝোলাটা রাখলে মাটিতে। দেখবার জন্যে কাছে এল লিওন্যা। হিসহিস করছিল ভোঁদড়টা, ছটফট করছিল, ঝোলাটা কামড়ে কাটবার চেষ্টা করছিল। ঝোলাটা চামড়ার, কিছুই করতে পারছিল না সে।

পরে টের পেলে যে লিওন্যা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হয়ে করুণ স্বরে সে বললে:

'লিওন্যা, খুলে দে আমায়! তুই যে আমার বন্ধু! তোর সঙ্গে কত আনন্দে কেটেছে আমাদের। মনে নেই, কেমন লুকোচুরি খেলেছিলাম আমরা? ছেড়ে দে আমায়। ফের তোর কাছে আসব, খেলব... মজার মজার অনেক খেলা জানি আমি!..'

লিওন্যা কিন্তু জবাবও দিলে না। দূরে সরে গেল সে। তারপর ব্রিগেডিয়ার এসে ঝোলাটা পিঠে নিয়ে চলে গেল।

ফের সায়রটা হয়ে উঠল শান্ত, চুপচাপ। ফের সূর্য তাকিয়ে রইল জলে আর হাঁসগুলো কী সব বলাবলি করে দুলতে লাগল ঢেউয়ে।

দুপুরে হাঁসগুলোকে খাইয়ে নিজেরাও খাওয়া সারার পর লিওন্যার চোখে পড়ল কাগতাড়ুয়া আস্তিন নাড়াচ্ছে।

'আরিঙ্কা, কাগতাড়ুয়া ডাকছে,' বললে লিওন্যা।

'চল, ছুটে যাই,' বললে আরিঙ্কা।

'হ্যাঁ, তোমাদের ডাকছিলাম!' আনন্দে ফিসফিস করলে কাগতাড়ুয়া, 'আমি সব জানি। দেখলাম সকালে ঝোলায় পুরে ভোঁদড়টাকে নিয়ে এলে। আর কী জানো? বুকটা আমার ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বেশ টের পাচ্ছি যে রস আসছে আমার গায়ে!'

'তোমার কি তাহলে সবুজ পাতা বেরবে?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা।

'ফের গাছ হয়ে উঠবে?' জিজ্ঞেস করলে আরিঙ্কা।

'হ্যাঁ, পাতা বেরিয়েছে আমার। এখনো খুব ছোটো ছোটো, তাহলেও খুঁটিয়ে দেখলে নজরে পড়বে। লিওন্যা, আমার টুপিটা আর পুরনো কোটটা খুলে কোথাও ফেলে দাও না। বড্ডো অসুবিধা হচ্ছে। এখন আমার দরকার রোদ্দুর, দরকার বৃষ্টি। তাহলেই গাছ হয়ে উঠব, গাছ!'

লিওন্যা কাগতাড়ুয়ার টুপিটা খুলে ফেলে দিলে ঝোপে।

'তাহলে তুমি আর গ্রহতারার গল্প শোনাবে না আমাদের?' জিজ্ঞেস করলে সে, 'ভারি খারাপ লাগছে!'

'আমার যখন পাতা বেরবে, তখন আরো কত গল্প জমবে আমার!' বললে কাগতাড়ুয়া, 'শীগগির করে ন্যাতাকানিগুলো সরাও!'

কাগতাড়ুয়ার পুরনো কোটটা খুলে ফেলল লিওন্যা, আড়কাঠটাও নামিয়ে নিলে। আর ঢিপির ওপর কাগতাড়ুয়ার বদলে দেখা গেল এক কচি গাছের কান্ড।

'হ্যাঁ রে, সবুজ সবুজ পাতা বেরিয়েছে ওর,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল আরিঙ্কা, 'ঐ দ্যাখ ডগাটায়!'

'তাই তো,' বলে হাসল লিওন্যা, 'তুমি আর কাগতাড়ুয়া থাকবে না, তুমি হবে পপলার গাছ! সবুজ পপলার!'

'তবে দেখো, সবুজ ডালপালা বেরুবার পর চুপ করে থেকো না।'

'আরে না, চুপ করে থাকব না।' ফিসফিসিয়ে বললে ভূতপূর্ব কাগতাড়ুয়া, 'যত ডালপালা, তত গল্প। লিওন্যা, আরিঙ্কা, তোমাদের দেখলে সর্বদাই খুশি হব আমি! আহ্ কী সুখ, কী সুখ! বাঁচব, সবুজ হয়ে উঠব, নিজে আনন্দ পাব, লোককে আনন্দ দেব।'

আর সন্ধেয় পাখি খামারে এল ফেন্যার বদলী কাতিয়া। বললে:

'এই তো ভালো হয়ে গেছি, এবার আমি কাজ দেখছি, তুই বিশ্রাম নে ফেন্যা, দুজনে মিলে কোনো অসুবিধা হবে না।'

ফেন্যা বললে:

'দুজনে মিলে দিব্যি চলবে কাজটা, ভারি খুশি লাগছে। তুই ফের শুবি ওপরের মাচায়, আমি নিচে।'

'আর আমরা?' জিজ্ঞেস করলে লিওন্যা।

'আমরা কোথায় শোবো?' জিজ্ঞেস করলে আরিঙ্কা।

ফেন্যা বললে:

'তোরা বাড়ি যাবি, তোদের সাহায্যের আর দরকার নেই। তবে মুশকিলের সময়টা ছিলি বলে তোদের দুজনকেই খুব বাহবা দিচ্ছি!'

শহরের মেয়ে

ভূমিকা

নেচায়েভো গ্রামে এল নীল হুড পরা মেয়ে

ফ্রণ্ট তখন নেচায়েভো গ্রাম থেকে অনেক দূরে। কামানের গর্জন শোনে নি গাঁয়ের যৌথচাষীরা, দেখে নি আকাশে বিমানযুদ্ধ, রুশ ভূমিতে যেখানে শত্রু পা দিয়েছে, প্রতি রাতে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঝলক। কিন্তু ফ্রণ্ট যেখানেই থাকে সেখানকার উদ্বাস্তুরা যাচ্ছিল নেচায়েভো গ্রামের ভেতর দিয়েই। যেত তারা পোঁটলা-পুঁটলি ভরা স্লেজ নিয়ে, থলে আর বস্তার ভারে কুঁজো হয়ে। মায়ের পোষাকের খুঁট ধরে চলত বাচ্চারা, বরফে পা ডুবে যেত। একটু করে থামত গাঁয়ে, কুটিরে কুটিরে আগুন পোয়াত, তারপর ফের রওনা দিত ভিটেছাড়া মানুষগুলো।

একদিন বিকেল শেষে, বুড়ো বার্চগাছটার ছায়া যখন লম্বা হয়ে গোলাঘর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তখন টোকা পড়ল শালিখিনদের দুয়ারে।

তাইস্কা নামে বাদামী চুলো চঞ্চল মেয়েটি ছুটে গেল পাশদিককার জানলায়, শার্সির যেখানটায় বরফ গলে আছে, সেখানে নাক ঠেকালে, তাতে দুটো বেণীই তার লাফিয়ে উঠল ওপরে। চেঁচিয়ে বললে:

'দুজন মেয়ে মানুষ! একজন কমবয়সী, মাথায় স্কার্ফ, আরেকজন একেবারে বুড়ি, হাতে লাঠি। আর দ্যাখো, দ্যাখো, একটা খুকিও আছে!'

তাইস্কার দিদি গ্রুশা মোজা বুনছিল। সেটা রেখে সেও গেল জানলার কাছে।

'সত্যিই একটা খুকি, মাথায় নীল হুড...'

'তা যা না, খুলে দে,' বললে মা, 'বসে আছিস কেন?'

গ্রুশা ঠেলা দিল তাইস্কাকে:

'যা না, তুই কি ভাবিস, সব কাজ বড়োরাই করবে?'

দরজা খুলতে ছুটে গেল তাইস্কা। ঘরে ঢুকল লোকগুলো। তুষার আর হিমের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

আর মা যখন ওদের সঙ্গে কথা কইছিল, জিজ্ঞেস করছিল কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাবে, জার্মানরা কত দূরে, ফ্রণ্ট কোথায়, ততক্ষণ দুই বোনে তাকিয়ে দেখছিল মেয়েটিকে।

'দ্যাখ, দ্যাখ, পায়ে জুতো!'

'কিন্তু মোজাটা ছেঁড়া!'

'দ্যাখ, ব্যাগটা কেমন আঁকড়ে ধরে আছে, আঙুল একটু আলগাও করছে না। কী আছে ওতে?'

'জিজ্ঞেস কর না!'

'তুই জিজ্ঞেস কর!'

এই সময় বাইরে থেকে এল রমানক। ঠাণ্ডায় গাল তার টকটক করছে। বিলাতি বেগুনের মতো লাল হয়ে সে অচেনা মেয়েটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বড়ো বড়ো করলে। এমনকি পা থেকে বরফ ঝাড়তেও ভুলে গেল।

নীল হুড পরা মেয়েটি কিন্তু বেঞ্চির কোণে বসেই রইল নিশ্চল হয়ে।

ডান হাত দিয়ে সে তার কাঁধ থেকে ঝোলা হলদে ব্যাগটাকে চেপে ধরে ছিল বুকের ওপর। নীরবে সে তাকিয়ে ছিল দেয়ালের কোন একটা দিকে, কিছুই যেন দেখছিল না, কিছুই শুনছিল না।

উদ্বাস্তুদের জন্যে মা গরম সুপ ঢাললে, এক টুকরো করে কেটে দিলে রুটি।

'হায় গো, পোড়া কপাল!' দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে, 'নিজেদেরই কষ্টের শেষ নেই, তাতে আবার বাচ্চা... মেয়েটি আপনার?'

'না,' বললে যুবতীটি, 'পরের।'

'এক পাড়ায় থাকতাম,' বললে বুড়িটা।

অবাক হল মা:

'অন্যের? তোর মা-বাপেরা কোথায় রে খুকি?'

মেয়েটি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে, কিন্তু কিছুই বললে না।

'ওর কেউ নেই,' ফিসফিসিয়ে বললে প্রথমা, 'গোটা পরিবার মারা গেছে। বাপ মরেছে ফ্রণ্টে, মা আর ভাইটি এখানে।'

মা তাকাল মেয়েটির দিকে, কেমন দিশেহারার মতো।

তাকিয়ে দেখল তার পাতলা ওভারকোটটার দিকে, নিশ্চয় অবাধে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকে তার ভেতর দিয়ে, তাকিয়ে দেখল তার ছেঁড়া মোজার দিকে, নীল হুডের তল থেকে করুণভাবে বেরিয়ে আসা শাদা শীর্ণ গলাটার দিকে।

মারা পড়েছে। সবাই মারা পড়েছে! আর বেঁচে আছে মেয়েটি। গোটা দুনিয়ায় তার কেউ নেই, একা!

মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল মা।

'কী নাম তোর রে খুকি?' আদর করে জিজ্ঞেস করলে সে।

'ভাল্যা,' উদাসীন গলায় জবাব দিলে মেয়েটি।

'ভাল্যা... তার মানে ভালেন্তিনা,' আপন মনে বললে মা, 'ভালেন্তিঙকা...'

ওরা ঝুলি গোটাচ্ছে দেখে মা ওদের থামালে:

'আজ রাতটা এখানেই থেকে যান। বেলা তো আর নেই। তাতে আবার ঝড় উঠেছে, ঈস, ঝেঁটুচ্ছে কেমন। সকালে উঠে রওনা দেবেন।'

থেকে গেল ওরা। ক্লান্ত লোকগুলোর জন্যে বিছানা পেতে দিলে মা। মেয়েটিকে সে শোয়ালে গরম জায়গাটায়—একটু গরম হয়ে নিক। পোষাক ছাড়লে মেয়েটি, নীল হুডটা খুললে, বালিশে

মাথা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। তাই সন্ধেয় যখন ঘরে ফিরল দাদু, তখন দেখা গেল তার বরাবরের গরম জায়গাটি বেদখল হয়ে গেছে। এ রাতটা তাকে শুতে হল সিন্দুকের ওপর।

রাতের খাবার পর সবাই চটপট নিঝুম হয়ে গেল; শুধু বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিল মা, কিছুতেই তার ঘুম আসছিল না।

রাতে উঠল সে, ছোট্ট নীল বাতিটা জেবলে আস্তে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। বাতির মৃদু আলোয় দেখা গেল তার নরম, একটু টকটকে মুখখানা, চোখের ঘন রোঁয়া, বাদামী ঝলক দেওয়া গাঢ় চুল লুটিয়ে আছে ফুলকাটা বালিশের ওপর।

'বেচারী অনাথা!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মা, 'দুনিয়ায় চোখ মেলতে না মেলতেই কত ঝড়ই না গেল তোর ওপর। ওইটুকুনি মেয়ের ওপর!'

অনেকক্ষণ মেয়েটির কাছে দাঁড়িয়ে রইল মা, কেবলি কী যেন ভাবলে। তার জুতো জোড়া নিয়ে তাকিয়ে দেখলে—জীর্ণ, বরফে ভেজা। কাল এদুটি পরে সে কোথায় যেন চলে যাবে। কিন্তু কোথায়?

খুব ভোরে, জানলা একটু ফরসা হতেই মা উঠে চুল্লি ধরাল। দাদুও উঠে পড়ল, বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে তার ভালো লাগে না। ঘরের ভেতরটা চুপচাপ, শোনা যাচ্ছিল শুধু ঘুমের নিশ্বাস, আর নাক ডাকাচ্ছিল রমানক। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে ছোট্ট বাতির আলোয় মা কথা কইলে দাদুর সঙ্গে। বললে:

'মেয়েটিকে রেখে দিই বাবা, ভারি মায়া লাগছে!'

দাদু ফেল্টবুট সারাচ্ছিল। সেটি নামিয়ে রেখে চিন্তিত ভাবে চাইলে মায়ের দিকে।

'মেয়েটিকে নেবে?.. মানিয়ে নিতে পারবে?' বললে সে, 'আমরা গেঁয়ো লোক আর ও শহুরে মেয়ে।'

'সবই তো সমান বাবা। শহরেও লোক থাকে, গাঁয়েও লোক থাকে। মেয়েটির যে কেউ নেই। তাইস্কার সই জুটবে। সামনের শীতে এক সঙ্গেই ভর্তি হবে ইশকুলে।'

দাদু গিয়ে চেয়ে দেখল মেয়েটিকে।

'তা... দ্যাখো। তুমি ভালো বুঝবে। বেশ, নেওয়াই যাক। পরে আবার নিজেই কান্না জুড়ো না!'

'ফুঃ, আমি অমন কাঁদি না!'

কিছু পরে উদ্বাস্তুরাও জাগল, রওনা দেবার তোড়জোড় শুরু করলে। কিন্তু মেয়েটিকে যখন ওরা জাগাতে গেল, মা ওদের থামালে:

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, জাগাবেন না। ভালেন্তিঙকাকে আমার কাছে রেখে যান। আত্মীয় স্বজন কাউকে যদি দেখেন, বলবেন, নেচায়েভো গ্রামে দারিয়া শালিখিনার কাছে আছে। ছেলেমেয়ে আমার তিনটি, এখন নয় চারটি হবে। না খেয়ে তো আর মরব না!'

উদ্বাস্তুরা গিন্নিকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। রয়ে গেল মেয়েটি।

'আরো একটি মেয়ে জুটল আমার,' আপন মনে বললে দারিয়া শালিখিনা, 'ভাল্যা, ভালেন্তিঙ্কা... তা... চালিয়ে নেব।'

নেচায়েভো গ্রামে এইভাবেই এল নতুন একটি মানুষ।

সকাল

গরম বিছানাটায় ভালেন্তিঙ্কা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে পড়ল না। কতকগুলো কণ্ঠস্বর মিশে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে, যেন অস্পষ্ট গুঞ্জনে রেডিও বাজছে কোথাও।

কোত্থেকে এক লোমশ ভুরুওয়ালা বুড়ো এসে ঝুঁকে দেখল তাকে, কী যেন বললে। তারপর তাকে আর দেখা গেল না। লোকটা সত্যিই ছিল নাকি, নাকি ওটা স্বপ্ন?

একটা বালতির ঝনঝনানিতে জেগে উঠল সে। ওর মনে হল বুঝি ঝনঝন শব্দটা হল জানলার শার্সিতে গুলি লেগে। লাফিয়ে উঠল সে, আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠত: 'জার্মান!'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য হল। চারিদিকে চুপচাপ। কাঠের গুঁড়ির দেয়াল, গুড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হালকা রঙের শণ গোঁজা, রোদ্দুরের ফিকে আভা দেখা যাচ্ছে সেখানে। জানলার শার্সিতে বরফ জমেছে, সেটা ফরসা হচ্ছিল ধীরে ধীরে। কী ছোট্ট জানলা! তাদের বাড়িটায় যে উ'চু উ'চু জানলা ছিল, একেবারেই তার মতো নয়।

তাদের বাড়ি!

ধূসর মরা দেয়াল, জানলাগুলোর জায়গায় হাঁ করা সব গর্ত, দুয়োরের কাছে ভাঙা ই'টের স্তূপ—এই রূপেই সে বাড়িটাকে দেখেছে শেষ বার।

নিবিড় উষ্ণতায় ছেয়ে আছে ভালেন্তিঙ্কা। সে উষ্ণতা আসছে বিছানাটা থেকে, সে উষ্ণতায় ভরে উঠেছে তার গায়ে চাপা দেওয়া ভেড়ার ছালের লোমের কুণ্ডলীগুলো। বহু দিনরাতের মধ্যে আজই প্রথম সে টের পেল যে তার শীত করছে না।

বরফ ঢাকা প্রান্তরগুলো উজিয়ে আসার সময় তার মনে হতে শুরু করেছিল যে তার গায়ে বরফের সুঁই বিঁধে আছে, সে বরফ কখনো গলবে না। আর এখন তার খেয়াল হল সে বরফগুলো অদৃশ্য হয়েছে, বেঁচে আছে সে, সারা শরীর তার গরম।

রান্নাঘরে চুল্লি ধরাচ্ছিল কর্ত্রী। দেওয়ালের ওপর দপদপ করছে আগুনের আভা। চুল্লির ধারের বিছানায় কে যেন মহানন্দে নাক ডাকাচ্ছে। ভালেন্তিঙ্কা তাকিয়ে দেখল সেদিকে। ঠোঁট ফুলিয়ে সেখানে অঘোরে ঘুমুচ্ছে একটা লাল-গাল দুরন্ত ছেলে।

রমানক! মনে পড়ে গেল ভালেন্তিঙ্কার, কিন্তু মেয়ে দুটো কোথায়? সঙ্গে সঙ্গেই তার খেয়াল হল কে যেন তাকে দেখছে। একটু উঠে তাকিয়ে দেখল ভালেন্তিঙ্কা। দেয়ালে রোদ্দুরের আভাগুলো এখন হয়ে উঠেছে জ্বলজ্বলে হলুদ। জমে যাওয়া শার্সিগুলোয় আগুনের ছটা।

বাইরে শুরু হয়েছে রোদ ভরা দিন। আর কোণ থেকে, অমসৃণ খাটের রেলিঙের পেছন থেকে কৌতূহলী চোখে তাকে তাকিয়ে দেখছে বাদামী চুলো একটি মেয়ে। ছোট্ট শিঙের মতো তার হালকা রঙের বেণীদুটো উঁচিয়ে আছে ওপর দিকে।

তাইস্কাকে চিনতে পারল ভালেন্তিঙকা।

'তোর মাসিরা কিন্তু চলে গেছে,' বললে তাইস্কা।

সশঙ্কে চারিদিকে চেয়ে দেখল ভালেন্তিঙকা:

'চলে গেছে? আমায় ফেলে... সে কী?'

'তুই আমাদের বাড়িতে থাকবি। মা বলেছে। এখানে থাকতে চাস?'

'জানি না। সবই সমান।'

'আচ্ছা, তুই ফাশিস্টদের দেখেছিস? খুব ভয়ংকর দেখতে?'

ভালেন্তিঙকা চুপ করে রইল। জার্মানদের নিয়ে কথা উঠলে ওর বুকখানা যেন পাথর হয়ে যেত। তাইস্কা কিন্তু শান্ত হল না:

'জার্মানরা সোজা তোদের ওখানে বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল, এ্যাঁ?'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল মা। রাগতভাবে বললে:

'জার্মানদের নিয়ে আলাপ জুড়লটা কে? আর কোনো বিষয় পেলি না? আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে, যা উঠে ছাড়া গে!'

তারপর ভালেন্তিঙকার কাছে এসে আদর করে জিজ্ঞেস করলে:

'গরম হয়ে নিয়েছিস তো?'

বিছানা থেকে চট করে লাফিয়ে নামল তাইস্কা, ঠেলে তুললে গ্রুশাকে। গ্রুশা উঠল আলসেমি করে। দেখতে সে গোলগাল, পাঁউরুটির মতো শাদা। পোষাক পরছিল সে, কিন্তু চোখে তার তখনো ঘুম জড়িয়ে। কেমন দূর দূর চোখে সে চেয়ে দেখল ভালেন্তিঙকার দিকে, নাকি ভালেন্তিঙকাও নেহাৎ স্বপ্ন?

আলু ভর্তি কড়াইটার কাছে বসল মেয়েদুটি। কড়াই থেকে তপ্ত ভাপ উঠছিল।

'মা, মা, দ্যাখো!' গ্রুশার দিকে ইশারা করে ফিসফিসিয়ে বললে তাইস্কা।

আধো ঘুমের মধ্যে গ্রুশা ছুরির বদলে চামচেটা নিয়ে আলুগুলোকে ঘাঁটছিল। মায়ে মেয়েতে সজোরে হেসে উঠল।

সচকিত হয়ে গ্রুশা চামচেটা ছুঁড়ে ফেললে। বললে:

'তাহলে ভালেন্তিঙকাও উঠে আলু ছাড়াক। বড়োরা কাজ করছে আর ও করবে না?'

'ওঠ আমার মেয়ে, ওঠ সময় হয়েছে!' বললে মা।

অনিচ্ছার সঙ্গেই ভেড়ার চামড়ার তল থেকে বেরিয়ে এল সে, হাতমুখ ধুয়ে এগিয়ে গেল কড়াইটার কাছে।

কী আশ্চর্য। অচেনা একটা মানুষ তাকে বলছে আমার মেয়ে। তার মানে ভালেন্তিঙকাও ওকে মা বলে ডাকবে?

গরম আলুর খোসা ছাড়াতে বসল ভালেন্তিঙকা, হাত পোড়াল, আর থেকে থেকেই চেয়ে দেখল গিন্নির দিকে। রোগা চেহারা। হালকা খয়েরি রঙের মসৃণ চুল। কপালে তিনটে বলিরেখা। চোখের রোঁয়াগুলোও বেশ বাদামী। তার তল থেকে তাকিয়ে আছে হাসি-হাসি নীল চোখ। হয়ত মনটা ভালো... তবে ভালেন্তিঙকার নিজের মা—কালো-চুলো, তরুণী—তার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই, এতটুকু না।

'মা, আমার মা!..'

ভয়ঙ্কর দাদু। তাইস্কা বকুনি খেল মায়ের কাছে

দরজা খোলার শব্দ হল। কে যেন ঘরে ঢুকল। চেয়ে দেখলে ভালেন্তিঙকা, আরেকটু হলেই হাত থেকে তার আলুটা পড়ে যেত। উশকো-খুশকো যে বুড়োটাকে সে কাল স্বপ্নে দেখেছে, সেই দাঁড়িয়ে আছে চৌকাটের কাছে, ওভারকোট খুলছে।

'কে এ?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে সে।

'আমাদের দাদু,' জবাব দিলে তাইস্কা, 'আমাদের বাবার বাবা।'

কী ঝাঁকড়া, শাদা, কোঁকড়া চুল? কী ঝোপের মতো ভুরু, চোখই দেখা যায় না!

ভালেন্তিঙকা যখন খুব ছোটো ছিল, তখন এই ধরনের বুড়োর কথা বলে ভয় দেখানো হত তাকে: 'ফের যদি কাঁদিস, তাহলে সেই বুড়োটা এসে তোকে বস্তায় পুরে নিয়ে যাবে!' এখন তাকে এই বুড়োর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে হবে, তাকে ডাকতে হবে দাদু। আর দেখেই বোঝা যাচ্ছে, লোকটা রাগী...

আলু সেদ্ধ আর শুয়োরের কিছু ছাঁট মাংস টেবিলে সাজিয়ে রাখল মা।

সুস্বাদু গন্ধটা টের পেতেই তার ঝাঁকড়া মাথাটা তুললে রমানক:

'ঈস, কী হিংসুটে, নিজেরা খাচ্ছে, আমায় ডাকছেও না!'

'ঘুমো না, খেয়ে কী হবে?' বললে দাদু।

রমানক কিন্তু ততক্ষণে বিছানা থেকে নেমে এসেছে।

ভালেন্তিঙকা বুঝতে পারছিল না কোথায় ও বসবে।

'জানলাটার কাছে বস,' ফিসফিসিয়ে বললে তাইস্কা। তাই বসল ভালেন্তিঙকা। সবচেয়ে সুবিধার জায়গা এটা। কোনো ঠেলাঠেলি নেই, শার্সির বরফ-গলা জায়গাটা দিয়ে বাইরেও তাকিয়ে দেখা যায়।

'মা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল গ্রুশা, 'ও যে আমার জায়গাটায় গিয়ে বসল, দেখেছ?'

'কী হল তাতে?' বললে মা, 'বসুক না।'

'না, বসবে না! আমি বরাবর ওখানে বসি। উঠে যা, তোর চেয়ে আমি বয়সে বড়ো!'

নীরবে উঠে দাঁড়াল ভালেন্তিঙকা। পাশেই একটা টুল ছিল, সেখানে বসতে যেতেই রমানক হাত দিয়ে তা ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল:

'খবরদার, এটা আমি নিয়ে এসেছি!'

'এখানে আয়,' ভালেন্তিঙকাকে বললে মা, 'আমার পাশে বস। আর লজ্জা করে হাত গুটিয়ে থাকিস না। কাউকে ভয় নেই, তুই তো আর এখন পর নস।'

ভালেন্তিঙকা ভাবছিল তাকে একটা প্লেট দেওয়া হবে। কিন্তু টেবিলে কোনো প্লেটই এল না, সবাই সরাসরি খেতে লাগল বড়ো সানকিটা থেকে। তাছাড়া চামচও ছিল না ওর। হাঁটুতে হাত রেখে চুপচাপ বসে রইল ভালেন্তিঙকা, বুঝতে পারছিল না কী করবে।

'খাচ্ছিস না যে?' জিজ্ঞেস করলে মা, 'আমাদের হাঁ করে বসে থাকার সময় নেই, ফুরিয়ে যাবে, খালি পেটেই থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

রমানক আর তাইস্কা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কেন জানি আস্তে হাসল।

'কী রে, মুখে আলু রোচে না বুঝি?' বললে দাদু, 'তা আমাদের এটা তো আর শহর নয়। সসেজ এখানে পাওয়া যায় না।'

মাথা নিচু করে বসে রইল ভালেন্তিঙকা। ওর মনে হল, ইচ্ছে করেই ওকে চামচ দেওয়া হয় নি, উঠে চলে যাবে কি?

'আরে, ওর চামচ নেই,' খেয়াল হল গ্রুশার, 'কিন্তু গেল কোথায় চামচেটা? আমি তো সবার জন্যেই দিয়েছিলাম।'

'নেই মানে?' ঝট করে বললে তাইস্কা, 'এই তো রয়েছে।'

রুটিটা সরাতেই কাঠের চামচটা দেখা গেল, আড়ালে পড়ে ছিল সেটা।

'কী কান্ড এসব?' ধমকে উঠল মা, 'ফাজলামি পেয়েছিস? চামচেটা দিয়ে ওর মাথায় এক ঘা বসিয়ে দে তো ভালেন্তিঙকা, পরের বার মনে থাকবে!'

এবং নিজেই তাইস্কাকে ঘা দিতে গেল। মেয়েটি কিন্তু ফুরুৎ করে ঢুকে গেল টেবিলের তলায়।

'বেশ, ওখানেই বসে থাক!' বললে মা, 'রমানকের সঙ্গে খুনশুটি করে পোষাচ্ছে না, এখন আরেক জনের পেছনে লেগেছিস? আর তুই ভালেন্তিঙকা, বসে আছিস মুরগীর মতো। কেন? দেখছিস চামচে নেই, তো চ্যাঁচা, "চামচে দাও!" নিজেকে অমন কষ্ট দিতে হয় কখনো?'

'আমাকেও একবার ভাঙা চেয়ারে বসিয়েছিল তাইস্কা,' বললে রমানক, 'বসতেই পড়ে গিয়েছিলাম!'

টেবিলের নিচে বসে থেকে থেকে বিরক্তি ধরে গেল তাইস্কার। অন্য দিক দিয়ে দাদুর পাশ কেটে সে বেরিয়ে এল। এত দূরে মা আর তার নাগাল পাবে না!

প্রথমটা মুখ গোমড়া করে ছিল তাইস্কা, তারপর অচিরেই সব ভুলে গেল, ফের মেতে উঠল ফূর্তিতে। চা খাওয়ার সময় সে ভালেন্তিঙকার দিকে একটা নীল বাটি এগিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে:

'নে, চিনি নে!'

ভালেন্তিঙ্কা বাড়িতে যা করত, সেই ভাবে দু'চামচ মেশাল। আর তাইস্কা ওদিকে গিয়ে ফের বসল রমানকের কাছে, ফের হাসিতে ফেটে পড়ল দু'জনে।

ভালেন্তিঙ্কা চুমুক দিলে, তারপর নাক মুখ সিঁটকিয়ে নামিয়ে রাখল কাপটা।

তাইস্কা আর রমানক খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

'কী, ছ্যাঁকা লেগেছে?' জিজ্ঞেস করলে দাদু, 'শহুরে চালে খাস নে, আমাদের মতো করে খা, গেঁয়ো লোকের মতো, প্লেটে ঢেলে। তাহলে ছ্যাঁকা লাগবে না।'

'মা,' চেঁচিয়ে উঠল গ্রুশা, 'ওই দ্যাখো, চিনির বদলে ওকে নুন দিয়েছে!'

তাইস্কার ঝুঁটি চেপে ধরতে গেল মা, তাইস্কা কিন্তু ততক্ষণে ছুটে পালিয়ে গেছে ঘরে।

ভালেন্তিঙ্কাকে ফের চা ঢেলে দিলে মা:

'খা মেয়ে, খা। আর তুই তাইস্কা, তোকে আমি ধরবই। তখন আর কাকুতি মিনতি চলবে না!'

নতুন পরিচয়

ইশকুলে চলে গেল গ্রুশা। ব্যাগের মধ্যে সে বইগুলো ছাড়াও নিলে এক বোতল দুধ, খানিকটা রুটি, আর মিষ্টি একটু শবজী। দুপুরের খাওয়া খেতে অনেক দেরি, খিদে লাগবে।

ভালেন্তিঙ্কাকে বড়ো ঘরে ডেকে আনল তাইস্কা, খাটের তল থেকে একটা বাক্স বার করলে। তাতে ছিল তার পুতুলগুলো, সবই দলামোচড়া, ন্যাংটা, রঙচটা নাক। কিন্তু তাদের দেখেই ভালেন্তিঙ্কার গাল লাল হয়ে উঠল। কতদিন সে পুতুল খেলে নি। তাইস্কা একটা পুতুলের ঠ্যাঙ ধরে তুলে দেখালে:

'এটা ভের্‌কা!'

আরেকটা তুললে ঝুঁটি ধরে:

'এটা ক্লাশ্‌কা!'

তারপর ফের ঢুকিয়ে রাখলে বাক্সে:

'ধুর! যাই, বাইরে গিয়ে খেলি!'

খেলতে বেরিয়ে গেল তাইস্কা। রমানকও তার সঙ্গ ধরলে।

মা বসল ইজের গেঞ্জি সেলাই করতে। কাল শনিবার, সংসারের সবাইকার জন্যে কাল স্নানের ব্যবস্থা করতে হবে, পরিষ্কার জামা কাপড় তৈরি থাকা চাই।

আর ভালেন্তিঙ্কা বসল বাক্সটির কাছে। অমনি পুতুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল, কথা কইতে শুরু করলে তার সঙ্গে।

'কোথায় ছিলি তোরা?' জিজ্ঞেস করলে ভালেন্তিঙ্কা, 'সবাই তোরা এমন দলামোচড়া কেন? কাপড় জামা পরা নেই?'

'আমরা জার্মানদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি যে,' বললে পুতুলগুলো, 'বরফ উজিয়ে, বন পেরিয়ে কেবলি আমরা ছুটেছি...'

'আচ্ছা, থাক থাক, ও কথা আমরা আর কইব না। এখন তোদের জন্যে পোষাক বানানো দরকার। একটু দাঁড়া।'

মায়ের কাছে এল ভালেন্তিঙ্কা।

'শুনুন...' বলেই থতোমতো খেয়ে গেল। কী বলে ডাকবে ওকে? দাশা মাসি? কিন্তু উনি তাকে 'আমার মেয়ে' বলে ডেকেছেন। তার মানে মা?

মা-ও তাকিয়ে দেখল, সেও দেখতে চাইছিল কী বলে সে ওকে ডাকে।

'শুনুন... আমায় একটা সুঁই আর কাঁচি দিন না?'

মা একটু হাসল, সুঁই কাঁচি দিলে তাকে। মেয়েটাও চটপট সরে গেল।

কী সুন্দর হলদে ফ্রক হচ্ছে পুতুলের জন্যে! কী জমকালো!

আর ভালেন্তিঙ্কা যখন নতুন পোষাকে পুতুলটাকে সাজিয়েছে, তখন হঠাৎ অলিন্দে শোনা গেল অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ, হাসাহাসি, কথাবার্তা, ঘরে এসে ঢুকল একপাল ছেলেমেয়ে।

'কী ব্যাপার?' অবাক হল মা, 'গোটা গাঁ এসে হাজির?'

'হাজির!' বললে তাইস্কা।

'ভারি মজা পেয়েছিস না? দুরন্তপনার আর জায়গা পেলি না?'

'না মা, দুষ্টুমি করব না আমরা। কেবল ভালেন্তিঙ্কাকে ওরা দেখবে। দেখতে তো ইচ্ছে হয় সবার!'

মা জবাব দেবারও সুযোগ পেল না, হুড়মুড় করে সবাই ঢুকল বড়ো ঘরে। আর মেঝেটা যাতে নোংরা না হয়, সেজন্যে প্রায় সবাই দরজার কাছে ফেল্টবুটগুলো খুলে খালি পায়ে দুমদাম করে এল শাদা মেঝের ওপর দিয়ে।

ঘাবড়ে গেল ভালেন্তিঙ্কা। একটু যেন বা সন্ত্রস্ত বড়ো বড়ো চোখ মেলে কখনো একে দেখতে লাগল, কখনো ওকে। কী চায় এরা? কী এদের দরকার?

প্রথমটা সবাই চুপ করে রইল। নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করলে মেয়েগুলো, হাসলে, উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল ভালেন্তিঙ্কাকে।

প্রথম কথা কইলে তাইস্কা:

'শহুরে মেয়ে কিন্তু! বরাবর শহরে ছিল! সেখানে বাড়ি কত বড়ো বড়ো জানিস? এই বাড়িটার ওপর আরেকটা বাড়ি চাপালেও নাগাল পাবি না!'

মেয়েদের মধ্যে একজন, ঠ্যাঙ-মোটা আলেঙ্কা বসল ভালেন্তিঙ্কার কাছে:

'তোর পুতুল ছিল?'

'ছিল,' আস্তে করে বললে ভালেন্তিঙ্কা, 'একটা পুতুল চোখ বুজতে পারত।'

'আর কী কী ছিল?'

'বাসন কোসন।'

'আর আমরা বাসন কোসন বানাই মাটি দিয়ে,' বলে উঠল কালো-চোখ ভারা্যা, 'কাপ, কেটলি, সব...'

'আর আমাদের বাসন কোসন এই এত!' হড়বড়িয়ে বলে উঠল তাইস্কা, 'শুধু আমার গুলো সব ভেঙে গেছে, কিছুটি আর নেই! কিন্তু ভারা্যার...'

'আর আমার? আমার গুলো বুঝি খারাপ?' চেঁচিয়ে উঠল আলেঙকা, 'আমার ফুলকাটা বাসনও আছে!'

এবং পরস্পর পাল্লা দিয়ে তারা ভালেন্তিঙকাকে শোনাতে লাগল, কী ভাবে গরমের সময় তারা খাদে চলে যায় মাটি আনবার জন্যে (খাদটায় এমনকি অনেক ছোট ছোট গুহাও রয়েছে!), কী ভাবে তা জলের সঙ্গে মেখে ছেনে পুতুলের বাসন বানায়, তারপর রোদে শুকোয়। ডিশ, হাঁড়ি, কড়াই সব! স্লাভকা ভিখ্‌রেভ এমনকি সামোভারও বানিয়েছিল। চুল্লিও বানিয়েছে মাটি দিয়ে, একেবারে সত্যিকারের চুল্লির মতো তা সত্যিকারের কাঠ দিয়ে জ্বালিয়েছে; আগুন জ্বলেছে, ধোঁয়া বেরিয়েছে নল দিয়ে!..

তবে গ্রুশা না থাকলে তাদের পক্ষে ওটা করা সম্ভব হত না। গ্রুশা তখন ইশকুলে ভর্তি হয়েছিল, সেখানে দিদিমণি তাদের শেখায় কী করে ব্যাঙের ছাতা বানাতে হয়। মাটির ব্যাঙের ছাতা গ্রুশা বাড়িতে নিয়ে আসে, তাইস্কাকে দেখায়। বাস, তাইস্কারও মাথায় খেলল: ব্যাঙের ছাতা যখন বানানো গেছে, তখন আরো কিছু বানানো যায়। কিন্তু গ্রুশা বললে, 'আর কিছু করা যাবে না। দিদিমণি যখন ব্যাঙের ছাতা করে দেখালেন, তার মানে শুধু ব্যাঙের ছাতাই করা চলবে।' তখন খাদে চলে যায় তারা, নানা রকম জিনিস বানাতে থাকে।

'বাসন বানাতে আমায় নেবে?' জিজ্ঞেস করলে ভালেন্তিঙকা, 'আমি পারব?'

'পারবি বৈকি,' বললে তাইস্কা, 'রমানক পর্যন্ত হাঁস নাকি স্লেজ, কী একটা বানিয়েছিল।'

'হাঁস নয়, ট্যাঙ্ক,' বললে রমানক, 'কিছুই বুঝিস না, অথচ বলতে যাস!'

'খাদটা কোথায়?'

'ওই তো, বাড়িগুলোর পেছনে। তবে এখন সেখানে বরফের ঢিপ জমে আছে।'

'বসন্ত কালে যাব, যখন বরফ গলবে।'

'আমি কিন্তু একটা পাখির খোঁজ জানি,' বললে রমানক, 'র‍্যাস্পবেরির ঝোপে। গ্রীষ্ম পড়তেই পাখিটা ফের সেখানে আসবে। এখনো পর্যন্ত তার বাসাটা আছে।'

'পাখি?' খুসি হয়ে উঠল ভালেন্তিঙকা, 'ফি বছর উড়ে আসে? নিজের বাসায়? কী রকম দেখতে? ছেয়ে রঙের?'

'একেবারে ছাইয়ের মতো। তবে বুকটা নীলচে...'

'তাহলে ওটা ভারাকুশকা।'

'তুই কী করে জানলি?' অবাক হল তাইস্কা, 'দেখেছিস বুঝি?'

'না জ্যান্ত দেখি নি,' বললে ভালেন্তিঙ্কা, 'তবে বইয়ে ছবি দেখেছি, ছোট্ট, ছেয়ে রঙের, নীল বুক। তুই আমায় পাখিটাকে দেখাবি রমানক?'

'আর অন্য পাখিও ছিল বইয়ে?' জিজ্ঞেস করলে ভারয়া।

'ছিল। দুনিয়ায় যত পাখি আছে সববার ছবি ছিল। রঙীন ছবি। মা পড়ে শোনাত আর আমি ছবিগুলো দেখতাম। হামিং বার্ড'ও ছিল তাতে।

'কীসের হামিং বার্ড?'

'এই এতটুকু, আঙুলের ডগার মতো ছোট্ট, আর এমন ঝকমকে যেন মণিমুক্তো বসানো!'

'অমন পাখি আবার হয় নাকি?' বললে আলেঙ্কা।

'আলবৎ হয়!' চেঁচিয়ে উঠল তাইস্কা, 'কত কী হয় তার কী জানিস! এমন কি মটরদানার মতো পাখিও হয়। তাই না ভালেন্তিঙ্কা?'

'বইটা কোথায় রে?' জিজ্ঞেস করল ভারয়া, 'সঙ্গে আনিস নি?'

'না।'

'ঈস, পোঁটলায় বেঁধে নিলেই পারতিস!'

'তখন তো জানতাম না...'

'কী জানতিস না?'

'জানতাম না যে এই সব ঘটবে...'

তাইস্কা চট করে একবার মায়ের দিকে চেয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে:

'কী ঘটেছে রে? জার্মানরা তোর আত্মীয় স্বজনকে খুন করেছে না?'

'হ্যাঁ।'

'মা-কেও?'

'হ্যাঁ।'

ভালেন্তিঙ্কার হাসি মিলিয়ে গেল। আস্তে করে সে হলদে ফ্রক পরা পুতুলটাকে নির্লিপ্তের মতো রেখে দিলে বাক্সে।

হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর দিনটার কথা তার মনে পড়ে গেল। শহরে তার শেষ দিন। বোমা পড়ছে শহরে। ধোঁয়া আর ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বাড়িটা। জানলাগুলোর জায়গায় হাঁ করা গর্ত। বাচ্চা তোল্যাকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামছে মা। ভালেন্তিঙ্কা যেন তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। ওই তো নীল পোষাক, এলিয়ে পড়া কালো চুল। সভয়ে সে চ্যাঁচাচ্ছে, 'ভাল্যা, ভাল্যা!' হঠাৎ বিস্ফোরণ। বোমা... কী সব ভাঙাচোরা কাঠের স্তূপের মধ্যে জ্ঞান ফিরল তার, নিশ্চয় ঝাপটায় ছিটকে এসে পড়েছিল এখানে। সেখান থেকে সে দেখলে একটা কালো গর্ত, ঢিপ হয়ে আছে ভগ্নস্তূপ, একরাশ ভাঙাচোরা ইঁটের তলে খানিকটা নীল পোষাক... ইঁটগুলো সে সরাতে শুরু করলে, ছুঁড়ে ছুঁড় ফেললে, চ্যাঁচাল, মাকে ডাকলে। মা সাড়া দিল না। অন্য লোকে এসে তাকে জোর করে কোথায় যেন টেনে নিয়ে গেল ভগ্নস্তূপ থেকে। তারপর রাস্তা, গ্রাম, বরফ, বন আর অবিরাম শীত...

'তোরা সব চুপ করে গেলি যে?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলে মা, 'কিছু হল নাকি?'

ঘরে ঢুকতেই তার চোখে পড়ল ভালেন্তিঙ্কার মুখখানা যেন একেবারে মড়ার মতো।

'কী নিয়ে কথা হচ্ছিল, এ্যাঁ?' মেয়েগুলোকে জিজ্ঞেস করলে সে, 'ওকে কিছু বলেছিস বুঝি?'

'আমরা কিছুই বলি নি,' বললে ভারুয়া, 'আমরা শুধু বইয়ের কথা বলছিলাম।'

'জার্মানদের কথাও আমরা কিছু বলি নি,' যোগ দিলে রমানক, 'তাইস্কা শুধু শুধিয়েছিল ফাশিস্টরা তার মাকে মেরেছে, সত্যি কি না?'

রেগে উঠল মা। উহ্, এমন রেগে উঠল যে একেবারে লাল হয়ে উঠল! তাইস্কার হাত চেপে ধরে ঠাস করে এক চড় মেরে বার করে দিলে ঘর থেকে।

'বেহায়া ছুঁড়ি,' তাইস্কাকে বকুনি দিতে লাগল সে, 'প্রাণে একটু মায়াও নেই! কলজেও নেই তোর। ঘাড়ের ওপর মাথার বদলে আছে একটা ফাঁপা হাঁড়ি!'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল তাইস্কা, আর মার মূর্তি দেখে মেয়েগুলো ছুটল রান্নাঘরে, চটপট করে ফেল্টবুট পরে সরে পড়ল একে একে।

'আয় মেয়ে,' আদর করে মা ডাকলে ভালেন্তিঙ্কাকে, 'আয় এখানে, আমার কাছে বস, শোন তোকে একটা গল্প বলি।'

ভালেন্তিঙ্কা নীরবে এসে বসল টুলে, মার পায়ের কাছে। কী একটা গল্প বলতে লাগল মা। ভালেন্তিঙ্কা সেটা শুনছিল না। তার চোখের সামনে তখন দাঁড়িয়েছিল তার নিজের মা, শেষ মুহূর্তে তাকে যেমন দেখেছিল সেই মূর্তিতে — ভীত দৃষ্টি, এলিয়ে পড়া কালো কুন্তল। দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে তোল্যা।

'মা, মাগো, মা!' মনে মনে ডাকল ভালেন্তিঙ্কা, এই জীবন্ত মাকে নয়, মরে যাওয়া মাকে। তারপর হঠাৎ জমে ওঠা গল্পটার মাঝখানেই এই জীবন্ত মায়ের কোলে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

ভালেন্তিঙ্কাকে কোনো সান্ত্বনা দিলে না মা, শুধু তার গাঢ় রঙের চুলগুলোয় হাত বুলতে বুলতে বললে:

'কাঁদ, কাঁদ বাছা, কাঁদ। কাঁদলে বুকটা হালকা হবে।'

চোখের জল তাইস্কার অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে সে দেখছিল ভালেন্তিঙ্কাকে। কী ব্যাপার? তাইস্কা নিজেও কেঁদেছিল, তবে সে তো চড় খেয়েছিল বলে। কিন্তু ভালেন্তিঙ্কা কাঁদছে কেন? তাকে তো বরং গল্প শোনাচ্ছিল মা!

'অত বড়ো মেয়ে, আবার কাঁদছে,' বললে রমানক, 'আমি যখন বড়ো ছিলাম, কখনো কাঁদি নি।'

'বোকাটা!' মা বললে ফিসফিসিয়ে, চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসল সে।

অসাধারণ স্নানের ব্যবস্থা

শনিবার সন্ধ্যেয় গরু বাছুর গোয়ালে তুলে মা চুল্লি থেকে প্রকান্ড এক গরম জলের গামলা নামিয়ে বললে:

'তৈরি হয়ে নে সবাই!'

'এবার উনুনে চাপব!' চেঁচিয়ে উঠল তাইস্কা, 'ভাপ খাব!.. ভালেন্তিঙ্কা চল, উনুনে চাপি।'

ভালেন্তিঙ্কা ভেবেছিল তাইস্কা ঠাট্টা করছে। কথা নেই, বার্তা নেই, উনুনে চাপতে যায় কে?

'অবাক করলি ভালেন্তিঙ্কা,' বললে গ্রুশা, 'কিছুই বোঝে না। আবার বলে কিনা শহুরে মেয়ে!'

মা ইতিমধ্যে চুল্লি থেকে হাঁড়ি পাতিল সব সরিয়ে, চুল্লির ভেতরে, পাশে — সর্বত্র টাটকা খড় বিছতে লাগল। তারপর গামলায় গরম জল ঢেলে বার্চগাছের ডালপালা দিয়ে গড়া একটা ঝাড়ুনি গুঁজে ঢুকিয়ে দিলে চুল্লির ভেতর। বললে:

'স্নানের ব্যবস্থা তৈরি। কে আগে যাবে?'

'আমি!' চেঁচিয়ে উঠে চটপট ফ্রক ছাড়ল তাইস্কা, 'আমি তৈরি!'

'সেটি হচ্ছে না,' আপত্তি করলে গ্রুশা, 'তুই পরে। তোর চেয়ে বয়সে বড়োরা রয়েছে না?'

কিন্তু গ্রুশা যখন কথা বলছে, কোমরের বেল্ট খুলছে, তাইস্কা ততক্ষণে উঠে গেছে চুল্লিতে। চুল্লির দরজা বন্ধ করে দিলে মা আর তাইস্কা সেখানে জল ছিটকিয়ে কী যেন বলতে লাগল আনন্দের আতিশয্যে।

'তুইও ঢোক,' ভালেন্তিঙ্কাকে বললে মা, 'চুল্লিটা অনেক বড়ো, এঁটে যাবি।'

'সারা গায়ে যে কালি লেগে যাবে!' ফিসফিসিয়ে বললে ভালেন্তিঙ্কা।

'সাবধানে উঠবি। দেয়ালে গা লাগাবি না।'

পোষাক ছাড়লে ভালেন্তিঙ্কা, আনাড়ীর মতো উঠতে গিয়েই চুল্লির কালিঝুলি মাখা মুখটায় কাঁধ ঘসে গেল।

'সঙ সাজলি তো!' হেসে উঠল মা।

'ঢুকে পড়, ঢুকে পড় শীগগির!' ভেতর থেকে চ্যাঁচাল তাইস্কা, 'আমি তোর ময়লা ছাড়াব ঝাড়ুনিটা দিয়ে!'

চুল্লির ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছিল ভালেন্তিঙ্কা, কিন্তু একবার ঢোকার পর আয়োজনটা তার ভালোই লাগল। সিক্ত একটা উত্তাপ জড়িয়ে ধরল তাকে। বার্চের পালা আর টাটকা খড়গুলোর গন্ধ ছড়াচ্ছিল ঝাঁঝালো। সাবান জলে ঝাড়ুনিটা ডুবিয়ে তাইস্কা তাই দিয়ে ছপছপ করে তার পিঠে বাড়ি মারতে লাগল। তারপর সাবান মাখা ছোবড়া দিয়ে পরস্পরের গা ঘষলে দুজনে। ভারি চমৎকার লাগল ভালেন্তিঙ্কার।

চুল্লির ভেতরটা অন্ধকার, শুধু ঢোকার দরজাটার ফাটলগুলো চকচক করছিল, যেন একটা সোনার ধনুক। গন্ধভরা উত্তপ্ত অন্ধকার, পাশেই রেশমের মতো আর্দ্র বিচালি, উষ্ণ বৃষ্টি ঝরানো ওই ঝাড়ুনিটা — সবকিছু মিলিয়ে যেন নড়াচড়ার ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল, মিইয়ে এল, মরে গেল। এমন কি তাইস্কাও শান্ত হয়ে শুয়ে রইল বিচালির গাদায়।

ইভানুশকার গল্পটা মনে পড়ল ভালেন্তিঙকার। ঠিক এই ভাবেই সে তাহলে বাবা-ইয়াগা ডাইনির কাছ থেকে লুকিয়ে বসে ছিল চুল্লিতে। মনে হল তার, সে নিজেই যেন ইভানুশকা, চুপ করে সে কান পেতে শুনতে লাগল, ঝাড়ুতে চেপে উড়ে যাচ্ছে না তো বাবা-ইয়াগা।

তবে চুল্লির ভেতর বেশিক্ষণ তো আর থাকা যায় না। গুমোট লাগতে লাগল। ইচ্ছে হল বেরিয়ে এসে তাজা নিশ্বাস নেয়।

'ভারি গরম লাগছে,' ফিসফিসিয়ে বললে ভালেন্তিঙকা।

'আমারও,' বললে তাইস্কা এবং হাঁক দিলে, 'মা, দরজা খোলো!'

'তাপ নেওয়া হল তাহলে!' বলে দরজা খুলে দিলে মা।

চুল্লি থেকে টুপ করে লাফিয়ে নামল তাইস্কা, ভালেন্তিঙকা কিন্তু ফের আটকে গেল, ঘাড়ে লাগল কালো ছোপ। ধুতে হল সেটা। কাঠের টবে ওদের বসালে মা, গরম জল ঢাললে গায়ে। চটের মতো একটা তোয়ালে দিলে গা মুছতে।

'গা মুছে পোষাক পরে নে, তারপর সোজা বিছানায় গা শুকাবি!'

তালিমারা যে জামাটা তাকে পরতে দেওয়া হল, ভালেন্তিঙকার মনে হল, কোনো অন্তর্বাসই তার কাছে কখনো এতটা তাজা লাগে নি। সারা শরীরটা তার যেন নিশ্বাস নিচ্ছিল। ভেজা হাতদুটো দিয়ে তখনো বার্চ ঝাড়ুনির গন্ধ যায় নি। ভালেন্তিঙকার কাছে ও গন্ধটা একেবারে নতুন, কেমন ঝাঁঝালো, কেমন অনভ্যস্ত!

রাতের খাওয়ার সময় দাদু জিজ্ঞেস করলে:

'তা আমাদের বিবিজানের কী মনে হল? ভালো লাগল আমাদের স্নানের ব্যবস্থাটা?'

'ভালো লাগল,' আস্তে জবাব দিলে ভালেন্তিঙকা।

কিন্তু দাদুর বিশ্বাস হল না:

'তাই কি আর লাগে! শহরে স্নানের ঘরে কত আলো, কত গরম, কত স্নান করার টব, কত রকম সব শাওয়ার। আর এখানে যেন হাঁড়ির মধ্যে ভাত সেদ্ধ। তা তুচ্ছিতাচ্ছিল্যি করিস না, আমাদের এখানে তো আর শহুরে স্নানের ঘর নেই।'

'মোটেই তুচ্ছিতাচ্ছিল্যি করছি না,' বলবার ইচ্ছে হল ভালেন্তিঙকার, 'চুল্লির ভেতর স্নান করতে আমার খুব ভালো লেগেছে, বাথরুমের চেয়েও।'

কিন্তু জবাব না দিয়ে সে দুধের মগে ঠোঁট ঠেকালে। দাদুকে তার ভয় লাগে।

রমানকের ট্যাঙ্ক ব্রিগেড। শাদা টেবল ক্লথে ফুটল লাল লাল ফুল

সেদিন সবার আগে ঘুম ভাঙল রমানকের। ঘুম ভাঙল একটা গাঢ় মদির গন্ধে, সারা বাড়িতে গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছিল। কেমন পিঠে-পিঠে গন্ধ... চুল্লির কাছে দেখা গেল চওড়া মাচার ওপর আলু আর ছানার পুর দেওয়া দু'সারি বড়ো বড়ো লাল লাল পিঠে। চট করে লাফিয়ে নামল রমানক।

'আজ কী পরব মা? ফের নববর্ষ?'

'আজ তোর মায়ের সন্তদিন।' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে মা। তারপর যোগ করলে, 'শুধু তোদের বাপ বাড়ি নেই। চিঠিও পাচ্ছি না কিছু...'

তখন খুব সকাল, তাই সবাই বাড়িতেই। দাদুও কাজে যায় নি, গ্রুশাও ইশকুলে যায় নি তখনো, তাইস্কাও পালায় নি তার বান্ধবীদের কাছে।

নীরবে মাথা নোয়ালে দাদু। ফ্রন্ট থেকে চিঠি আসে নি অনেক দিন। আর অবিরাম যুদ্ধ চলছে সেখানে।

'গত বছর কিন্তু বাবা ছিল,' বললে গ্রুশা, 'আমায় কেবলি বলত: "পড়, পড়, ভালো করে পড়াশুনা কর!" আমায় সে...'

'তোকে সে!' খেঁকিয়ে উঠল তাইস্কা, 'যেন কেবল তোর সঙ্গেই কথা বলত বাবা! আর আমায় যে বলত: "দেখিস তাইস্কা, দুষ্টুমি করিস না!"'

'আর আমায় বলত: "চটপট বেড়ে ওঠ!"' যোগ করলে রমানক।

সবাই মনে করতে লাগল কী সে বলত, কেমন করে। যদি এখন আসত! অন্তত দু'একদিনের ছুটিতে!.. মুখ ফিরিয়ে নিলে মা, গোপনে চোখের জল মুছলে।

চুপ করে রইল শুধু ভালেন্তিঙ্কা। শালিখিনদের বাবাকে সে দেখে নি, তাকে সে চেনে না, সেও চেনে না তাকে।

'নে হয়েছে,' বললে মা, 'কপালে থাকলে দেখে যাব, হিটলারও খতম হবে, বাপও ফিরবে ফ্রন্ট থেকে। এখন টেবিলে পিঠে দিয়েছি, খেতে বস!'

সকালের খাওয়ার পর মার ডাক পড়ল, যৌথখামারের গুদামে গিয়ে আলু বাছতে হবে। চটপট তৈরি হয়ে সে চলে গেল।

'আমার মায়ের যখন সন্তদিন হত, তখন উপহার পেত সে,' বললে ভালেন্তিঙ্কা।

'কে দিত?' টক করে প্রশ্ন করল তাইস্কা।

'সবাই। আমিও দিতাম। আমি একবার তাকে ছবি এঁকে উপহার দিয়েছিলাম।'

চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল তাইস্কার:

'আয়, আমরাও মাকে কিছু একটা উপহার দিই!'

'কিন্তু কী দিবি, কী তুই দিবি?' জিজ্ঞেস করলে গ্রুশা, 'কী তুই পারিস?'

'আর তুই কী পারিস?'

একটু ভাবতে লাগল গ্রুশা। মোজা বুনে দিলে কেমন হয়? কিন্তু মোজা তো সঙ্গে সঙ্গেই বোনা যায় না। মোজা বুনতে শুরু করেছিল সেই কবে, কিন্তু এখনো গোড়ালি পর্যন্তও এগোয় নি। মা-টা যে কী, একটু আগে বলতে পারে নি! তাহলে গ্রুশা হয়ত এতদিনে শেষ করে ফেলত মোজাটা!

'আর আমি কী করব আমি ঠিক করে ফেলেছি!' চেঁচিয়ে উঠল তাইস্কা, 'এক্ষুণি আমি সমস্ত মেটে হাঁড়িগুলো ধোব, সমস্ত লোহার বাসনগুলো মাজব, সমস্ত কাঁটা, সমস্ত চামচ। সব একেবারে ঝকমক করবে! কী পারব না? না?'

পাত্রে গরম জল ঢালল তাইস্কা, না-ধোয়া সমস্ত বাসনপত্র জড়ো করে কাজে লেগে গেল।

তার মাজা-ঘষার তাড়ায় ছিলকে উঠল নোংরা জলের ছিটে, ছাই, ঝুলকালি, ঝনঝন করতে লাগল বাসন, ঢঙঢঙ করতে লাগল ডেকচি।

'তা উপহার বটে!' বললে গ্রুশা, 'দাঁড়া, ভালো মতো একটা কিছু আমার মাথায় খেলুক, তারপর!'

'আর রমানক তুই কী করবি?'

'কেন দেখতে পাচ্ছিস না?'

শাদা রঙ করা চওড়া চুল্লিটার ওপর কাঠ কয়লা দিয়ে ট্যাংক আঁকছিল রমানক। সামনে মস্ত একটা ট্যাংক, জাঁদরেল তার ক্যাটারপিলার, মস্তো কামান—এটা 'ক-ভ' ('ক্লিম ভরোশিলভ'), তার পেছনে ছোটো আকারের হালকা দ্রুতগতি ট্যাংক পুরো এক ঝাঁক।

পড়শীদের বাড়ির একটি ছেলে আহত হয়ে ফ্রন্ট থেকে বাড়ি এসেছে। ট্যাংক চালাত সে, তার সঙ্গে ভালো ভাব আছে রমানকের। তার কাছ থেকে রমানক শুনেছে যে মজবুত, দ্রুতগতি সোভিয়েত ট্যাংকগুলোকে জার্মানরা ভয় পায়। সেই জন্যেই অতগুলো করে সে তাদের এঁকেছে। চুল্লি থেকে ট্যাংকগুলো যাচ্ছে জানলার দিকে, গোলা ছুটছে সব কটা কামান থেকে। ছুটছে চারিদিকে, এমনকি চিমনি আর সিলিং পর্যন্ত গিয়ে লেগেছে গোলা।

রমানক, তাইস্কা, গ্রুশার দিকে চেয়ে দেখল ভালেন্তিংকা। সবাই তারা কিছু না কিছু উপহার দিচ্ছে মাকে।

ভালেন্তিংকারও কি কিছু উপহার দেবার সাধ হচ্ছে না?

'ও তো আমার মা নয়, ওদের মা,' একগুঁয়ের মতো ভাবল সে, 'ওরা দিতে চায়, দিক...'

তাহলেও মাকে — দারিয়া মাসিকে কিছু একটা দেবার ভারি ইচ্ছে হল তার। নাই বা হল নিজের মা, কী এসে যায়!

'আর তুই কিছু একটা আঁক না?' তাইস্কা বললে তাকে, 'ওই যে ওখানে, বেঞ্চির নিচে এক বয়াম রঙ আছে। দাদু খাট রঙ করেছিল ওতে। শোন বলি, ওটা নিয়ে এই টেবল ঢাকাটার ওপর ফুল আঁক, বর্ডার দিয়ে। পারলে আমি নিজেই আঁকতাম।'

'সেটা কি ভালো হবে?'

'কেন হবে না! ফুল যে! আমি পারলে নিজেই আঁকতাম। বল, তুই আঁকবি না। জানি জানি। তোর তো আর নিজের মা নয়।'

মিনিট খানেক ভাবলে ভালেন্তিঙ্কা। টেবল ঢাকনির ওপর ফুল আঁকা উচিত কি? তার মা নিশ্চয় বলত, না, উচিত নয়। কিন্তু সেখানে উচিত না হলেও হয়ত এখানে চলবে? রমানকও তো চুল্লিটা এঁকে ভরিয়ে দিলে!

বেঞ্চির তল থেকে রঙের বয়ামটা বার করলে ভালেন্তিঙ্কা। তারপর টেবলটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে টেবল ঢাকনির ঝালরের দিকে ভীরু ভীরু পোঁচে ফুটিয়ে তুলল একটা মস্তো লাল ফুল।

'বাহ্ কী সুন্দর!' বললে তাইস্কা, 'একেবারে যেন জীবন্ত! গ্রীষ্মকালে এমনি ফুল ফোটে আমাদের বাগানে। নে, আরো আঁক!'

দ্বিতীয় ফুলটা হল আরো সুন্দর। পাপড়িগুলো তার আরো চওড়া, আরো স্পষ্ট। তৃতীয় ফুলটা হল একটু বাঁকা, তবে সেটা প্রায় চোখেই পড়ে না। রমানক তার ট্যাঙ্ক আর ফাটন্ত গোলাগুলি ফেলে গোল গোল নীল চোখ মেলে দেখতে লাগল কীভাবে শাদা টেবিল ঢাকনির ওপর গজিয়ে উঠছে লাল লাল ফুল।

'এই মাগো!..' হঠাৎ শোনা গেল একটা সন্ত্রস্ত চিৎকার, 'কী করলি বল তো!'

বড়ো ঘর থেকে বই হাতে বেরিয়ে এসে দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়েছে গ্রুশা।

'করেছিস কী! গোটা টেবল ক্লথটা নষ্ট করলি! আচ্ছা ধমক খাবি এবার!'

তুলি কেঁপে গেল ভালেন্তিঙ্কার হাতে, শেষ ফুলটার শেষ পাপড়িটা নুয়ে গেল, যেন রোদে নেতিয়ে পড়েছে।

তাইস্কা, রমানক আর ভালেন্তিঙ্কা তাকাল গ্রুশার দিকে, নিজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কিছু একটা যেন অন্যায় হয়ে গেছে এমনি একটা ঝাপসা ভাবনা তাদের পেয়ে বসল। কিন্তু শাদা টেবিল ঢাকনাটায় লাল ফুল থাকলে ক্ষতিটা কী? আর গ্রুশা বলছে কিনা, 'ধমক খাবি!'

ওপরের ফুলো ঠোঁটটা উলটিয়ে গ্রুশা বললে:

'তবে আমায় কিন্তু এর মধ্যে জড়াবি না বলে দিচ্ছি। নিজেরা পাকিয়েছিস, নিজেরাই ভুগবি।'

'আমি কিন্তু কিছু পাকাই নি,' বললে রমানক, 'আমি শুধু দেখছিলাম।'

'তবে কি আমি পাকিয়েছি, এ্যাঁ?' চেঁচিয়ে উঠল তাইস্কা, 'আমি সেই তখন থেকে বাসন ধুয়েই যাচ্ছি। টেবল ঢাকনিতে আমি মোটেই কোনো ফুল আঁকতে যাই নি!'

'শহুরে মেয়ে, গোল্লায় গেছে!' কড়া গলায় বললে গ্রুশা, 'আদর পেয়ে পেয়ে গোল্লায় গেছে!' বলে ঢুকে গেল বড়ো ঘরে।

হঠাৎ সমস্ত আনন্দ উড়ে গেল ভালেন্তিঙ্কার। নিজের হলদে হাত-ব্যাগটা থেকে সে একটা রুমাল বার করে ধীরে ধীরে রঙ ঘসে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু জিনিসটা ছিল তেল রঙ, কিছুই তার উঠল না। ভয়ে আর দুঃখে ভালেন্তিঙ্কার বুকখানা মুছড়ে উঠল। কী করে বসেছে সে! কেন সে শুনল তাইস্কার কথা? এবার কী বলবে মা, কীইবা সে জবাব দেবে?

রঙের বয়ামটা লুকিয়ে রেখে এক কোণে গিয়ে বসল ভালেন্তিংকা। জানলার ওপাশে বরফের মড়মড়, আঙিনায় কোন শব্দ, রাস্তায় কারো একটা গলার আওয়াজ — সবেতেই চমকে উঠছিল সে: ঐ বুঝি মা এল!

তারপর দাদু। এটা দেখলে কী বলবে দাদু?

'তোমাদের শহরে হয়ত টেবিল ঢাকনি নষ্ট করা সম্ভব, তবে আমাদের এখানে ওটা চলে না! অমন নবাবের বেটী আমাদের দরকার নেই।' নিশ্চয় এই কথা বলবে সে।

হয়ত আধ ঘণ্টা কেটেছিল, হয়তবা এক ঘণ্টা। অলিন্দে পায়ের শব্দ শোনা গেল, বারান্দার ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল দরজা, ঘরে ঢুকল মা। অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দেখে অবাক লাগল তার। নজর করে সে দেখল চারিদিকে।

'এটা আবার কী?!' চুল্লির ওপরকায় বিচিত্র আঁকিবুঁকিগুলো দেখে রেগে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এ সব কী নষ্টামি হয়েছে!'

তারপর তাইস্কার দিকে চোখ পড়তে হতাশে হাত নাড়লে সে:

'বাহবা আমার রক্ষেকালীর বাচ্চা! নিজের চেহারাটা দ্যাখ তো, কী ছিরি করেছিস? গা, হাত, ফ্রক — সব একেবারে ঝুলকালি মাখা!'

তারপর শাদা টেবিল ঢাকনিতে লাল ফুলগুলো দেখে মা একেবারে রাগে লাল হয়েই উঠল:

'ওই মাগো! সত্যি কী কাণ্ড? ঘর ছেড়ে এক দণ্ড বেরনোও যাবে না! কে এটা এঁকেছে, এ্যাঁ? কে?'

তিনজনেই অস্বস্তিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। শুধু একা গ্রুশা শান্তভাবে দাঁড়িয়েছিল বড়ো ঘরের দরজায়:

'কী, উপহার দেওয়া হল?'

ঝাড়ু থেকে একটা কাঠি খসিয়ে নিলে মা:

'তাইস্কা, আয় তো এদিকে দেখি, তোকে একটু বার্চ কাঠির প্রসাদ দিই। আয়, তোকে টেবল ঢাকনিতে ফুল আঁকার মজা দেখাই।'

'আমি আঁকি নি!' চেঁচিয়ে উঠল তাইস্কা।

'আমি এঁকেছি...' আস্তে করে বললে ভালেন্তিংকা।

'তুই?' অবাক হল মা, 'তুই এঁকেছিস? কে তোকে বললে আঁকতে?'

তাইস্কার দিকে তাকাল ভালেন্তিংকা, তার ভীত দৃষ্টি নজরে পড়তেই চোখ নামিয়ে নিলে সে:

'কেউ বলে নি, আমি নিজেই...'

মার তখনো রাগ যায় নি, বেঞ্চির ওপর বাড়ি মারছিল সে কাঠিটা দিয়ে। ভালেন্তিংকাকে মারতে তার হাত উঠছিল না। কী করেই বা মারে, এমনিতেই যা থরথর করে কাঁপছে। অথচ না মারলে নিজের ছেলেমেয়েগুলোর অভিমান হতে পারে: এমন কাণ্ড করলে তাইস্কাকে সে তো নিশ্চয় পিটিয়ে ঢিট করত।

'আমি ভেবেছিলাম তোমায় উপহার দেব,' বললে ভালেন্তিংকা, 'আমরা সবাই উপহার দেব ঠিক করেছিলাম!'

'উপহার! কীসের উপহার?'

'মানে, রমানক তোমার জন্যে ট্যাংক এ'কেছে। সমস্ত বাসন ধুয়েছে তাইস্কা। আর আমি, আমার মনে হল ফুল থাকলে সুন্দর হবে। আমরাই এসব ভেবে ঠিক করেছিলাম, তোমার তো আজ সন্তদিন!'

মার ভ্রুকুটিত ভুরু খুলে গেল। ব্যাপারটা কী না জেনেই সে যে ক্ষেপে উঠেছিল, তার জন্যে লজ্জাই হল তার। কাউকে যে আর বকুনি দেবার, পিটুনি দেবার দরকার নেই, তাতে খুশিই হল সে। বেঞ্চিতে বসে কাঠিটা ফেলে দিয়ে সে হেসে উঠল। এই সময় ঘরে ঢুকল দাদু।

'বাবা, দ্যাখো, দ্যাখো!' হাসতে হাসতে সে বললে, 'দ্যাখো না, কী সব উপহার পেয়েছি আমি, পুরো এক ব্রিগেড ট্যাংক, ঝকঝকে মাজা ঘসা বাসনপত্র, আর লাল লাল ফুল... ভগবান! দ্যাখো, আমার কেমন সব ছেলেপিলে — আনন্দে বুক ভরে ওঠে!'

তারপর টেবিল ঢাকনিটার দিকে তাকিয়ে যোগ করল:

'আরে সত্যি রে, ফুল থাকাতে সত্যি সুন্দর দেখাচ্ছে!'

ফের হাসিখুশি শান্তি ফিরল সংসারে। একলা গ্রুশাই শুধু রইল মনমরা। কী উপহার মাকে দেওয়া যায়, সেটা সে ভেবে ওঠার সুযোগ পেল না।

অতিথিদের চা পান ও মায়ের সমালোচনা

সন্ধ্যায় গরু বাছুর ঘরে তোলার পর নিমন্ত্রিতরা এল মায়ের কাছে। টেবিল সাজানো হয়েছে, সামোভার ফুটছে, মস্তো একটা থালায় শোভা পাচ্ছে পিঠেগুলো।

প্রথমে এল মোটাসোটা মারিয়া মাসি, গায়ে তার টুকরো জুড়ে শেলাই করা খাটো ফার কোট। সামনের ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে সে ফলাও করে ক্রুশ করলে, তারপর সাবেকী রীতিতে কুর্নিশ করলে প্রথমে দাদু, তারপর মাকে। তারপর কোট খুললে সে, তবে চওড়া রঙচঙে স্কার্ফটা তার কাঁধেই রইল। হঠাৎ তাকে দেখে ভালেন্তিংকার তুলোভরা টি-কোজির কথা মনে পড়ল, যা দিয়ে চায়ের গরম কেটলি ঢেকে রাখত মা।

ছেলেপিলেদের দিকে তাকিয়ে মারিয়া মাসি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'দস্যিরা সব বেঁচে বর্তে আছো তো?'

'বেঁচে আছি!' চেঁচিয়ে জবাব দিলে তাইস্কা।

'আর নতুনটি কোথায়? যেটি এসেছে?'

রমানক ভালেন্তিংকার দিকে আঙুল দেখালে:

'এই যে, এখানে!'

লাল হয়ে চোখ নামিয়ে নিলে ভালেন্তিংকা।

'আচ্ছা...' অননুমোদনের সুরে টেনে টেনে বললে মারিয়া মাসি, 'মন্দ নয় মেয়েটি, তবে বড়ো রোগা। ইস, পাগুলো কী কাঠি-কাঠি। অমন মেয়ে গাঁয়ের কোন কাজেই বা লাগবে? মাল তুলতেও পারবে না, নামাতেও পারবে না...'

'আমিও তো তাই বলি,' বললে দাদু, 'গাঁয়ে থাকা মানে মাটি চষা। আর মাটিকে ভায়া, তোয়াজ করতে হয়। কিন্তু ও কী করতে পারবে? বিবিজান!'

আরো একজন অতিথি এল ঘরে—উস্তিনিয়া বুড়ী, ঢ্যাঙা, শুকনোটে, পরিপাটী। গৃহকর্তাদের নমস্কার করে সে ঠোঁট চেপে তাকিয়ে রইল ভালেন্তিঙ্কার দিকে:

'এই মেয়েটিকে নিয়েছ?'

'এইটিই,' বললে মা।

'হুম... তা কী করবে ওকে নিয়ে?'

'কী আর করব? বাড়ুক এখানে!'

'বাড়বে তো বটে। কিন্তু কী হবে? ওর বাপকেও চেনো না, মাকেও চেনো না। কী রকম লোক ছিল কে জানে, হয়ত ভালো, হয়ত বা নয়...'

উস্তিনিয়া বুড়ীর দিকে একবার তাকিয়েই ফের চোখ নামিয়ে নিলে ভালেন্তিঙ্কা।

'কেমন চাউনিটা দেখলে?' আক্ষেপ করে উঠল উস্তিনিয়া বুড়ী, 'যেন চোখ দিয়ে গিলে খাবে!'

'আসুন, বসুন,' বললে মা, 'চা খান।'

টেবিলে বসতে না বসতেই আবার হড়াম করে উঠল দরজা, ঘরে ঢুকল নতুন অতিথি, ভাসিলিসা মাসি, লোকে ডাকে কার্কগিন্নি। নামটা জুটেছে তার প্রকাণ্ড নাকখানার জন্যে। সেও এসেই তাকিয়ে দেখতে লাগল ভালেন্তিঙ্কাকে।

'মরি, মরি! দেখেই বোঝা যায় আমাদের গোত্রের নয়। ইস, মুখখানা কী ফ্যাকাশে। কালো রুটি খেয়ে এখানে টিকবে তো?'

ভালেন্তিঙ্কা উঠে গিয়ে বসলে অন্ধকার বড়ো ঘরখানার কোণে। সবাই যখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, তখন ভারি বিছছিরি লাগে, যেন সে মানুষ নয়, একটা মাল!

টেবিলে বসে অতিথিরা যুদ্ধ নিয়ে আলাপ জুড়লে, বললে, শুনছি নাকি আমাদের সৈন্যরা তাড়িয়ে দিয়েছে জার্মানদের, কাল গোটা যৌথখামার কাঠ বয়ে দেবে স্টেশনে, বললে, শণের কাপড়গুলো এখন পরিষ্কার করা ভালো, রোদ গরম হতে শুরু করেছে, বরফ হয়ে উঠেছে ঝাঁঝালো, সব দাগ খেয়ে যাবে... তার পর আবার ভালেন্তিঙ্কার কথা।

'সংসার বাড়াচ্ছিস কেন, বল তো দারিয়া?' শুরু করলে মারিয়া মাসি, 'দিনকাল ভালো নয়, কতগুলো পেট, স্বামী গেছে যুদ্ধে, ফিরবে কি ফিরবে না, কে জানে... মেয়েটাও খাটিয়ে নয়, কী রোগা! ওকে নিয়ে ঝামেলায় পড়বি!'

'না, না, কোনো লাভ হবে না,' খেই ধরলে উস্তিনিয়া বুড়ী, 'ও তোর আপন হবে না, তোকে ভালোও বাসবে না, ভক্তিছেদ্দাও করবে না। যেমন আছিস তেমনি পরই থেকে যাবি। চুলের রঙেও তোদের সঙ্গে মোটেই খাপ খাবে না। তোদের চুল সবারই হালকা রঙের, ওরটা কেমন গাঢ়।'

'হয়েছে, হয়েছে বাবা তোমাদের!' আপত্তি করলে কার্কাগিন্নি, 'অন্য দিকটাও তো দেখতে হয়। এই ধরনের অনাথরা তাহলে যাবে কোথায়? যুদ্ধ চলছে একটা। অভাগা কি আর কম হবে? কী করা যাবে তাদের নিয়ে? কোনো রকম একটা ব্যবস্থা চাই তো...'

ভালেন্তিঙ্কা কান পেতে ছিল, মা কী বলে। সেও কি প্রথম দু'জনের কথায় সায় দেবে? তাহলে কী করবে ভালেন্তিঙ্কা? এই যে বাড়িতে কেউ তাকে ভালোবাসে না, সেখানেই থাকতে হবে তাকে?

অতিথিদের কথাগুলো সব শুনে মা তাকিয়ে দেখল ভালেন্তিঙ্কা আছে কিনা। তারপর চিন্তিতভাবে বললে:

'সংসার আমার বড়ো, তাতে আমার দুঃখ নেই। দু'মুঠো সবারই জুটবে। ওকে দিয়ে খাটুনির কাজ ভালো হবে না, তা কী করা যাবে! যেমন পারে তেমনি খাটবে। তা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই। আমার ভাবনাটা শুধু এই,' বিষণ্ণ সুরে বলে গেল মা, 'আমার শুধু একটা কষ্ট: আপন হয়ে উঠবে কিনা, স্নেহ মানবে কিনা! মা বলে আমায় ডাকে না, কিছুতেই ডাকে না। ডাকতে চায় না! নাকি তাই সত্যি, যেমন ছিল তেমনি পর হয়েই থেকে যাবে?'

নিশ্বাস ফেললে ভালেন্তিঙ্কা।

নিজের কোণটা থেকে সে তাকিয়ে দেখল মায়ের দিকে, হাতে ভর দিয়ে সে চিন্তিতভাবে বসে আছে রান্নাঘরে, টেবিলের সামনে।

'মা... মা...' মনে মনে ফিসফিস করলে ভালেন্তিঙ্কা। এ মেয়েটিকেও মা বলে ডাকার ইচ্ছে হল তার। কিন্তু কথা ফুটল না। দাশা মাসি হয়েই সে থেকে গেল। ভালেন্তিঙ্কা তার কিছুই করতে পারল না।

সেই সন্ধেতেই অতিথিদের বিদায় দিয়ে মা বসল কালি কলম নিয়ে, গ্রুশার কাছ থেকে কাগজ চেয়ে নিয়ে চিঠি লিখলে। লিখলে ফ্রন্টে, স্বামীর কাছে। জানালে যে যৌথখামারের কাজকর্ম আস্তে আস্তে সামলে উঠছে, সংসারে কষ্ট নেই, ছেলেমেয়েরা সুস্থ আছে, বাপের পথ চেয়ে রয়েছে।

'তাছাড়া আরেকটা কথা,' লিখলে সে, 'তোমার পরামর্শ দরকার। ভালেন্তিঙ্কা নামে একটি অনাথা উদ্বাস্তু মেয়েকে সংসারে নিয়েছি। মনে হয় ভালোই করেছি। তবে কেউ কেউ বলছে, না নিলেই হত, আমায় ভর্ৎসনা করছে। তুমি কি বলো? নাকি লোকের কথাই ঠিক, পরের মেয়ে কখনো আপন হয় না?'

মা ছাড়া মেয়েদের ঘরকন্না

অন্ধকার থাকতে থাকতেই মা চলে গেল স্টেশনে কাঠ পৌঁছতে।

তারপর জানলার শার্সি যখন চিকচিক করে উঠল, দাদু গ্রুশাকে উঠিয়ে দিয়ে বললে:

'ওঠ রে, বাচ্চা গিন্নি, চুল্লি ধরাতে হবে। ইশকুলে আজ যেতে হবে না, বাড়িতে মা নেই।'

চোখ খুলছিল না গ্রুশার, মাথা তুলতে পারছিল না সে। কিন্তু দাদু ছাড়লে না:

'ওঠ, ওঠ, বাছুরটা ডাকছে, খাওয়াতে হবে। মুরগীগুলোও অলিন্দে জুটেছে। ওদেরও দানা দরকার। ওঠ, ঘরকন্না দ্যাখ। বেশি কথা বলার আমার সময় নেই। যৌথখামারের গোলাঘরে কাজ পড়ে আছে।'

চলে গেল দাদু। গ্রুশা উঠল এবং উঠেই জাগিয়ে দিল তাইস্কা আর ভালেন্তিঙকাকে:

'চল, আমায় সাহায্য করবি। একলা আমায়ই সব করতে হবে, নাকি?'

'বাইরের কাজগুলো আমার, ঘরের কাজগুলো তোর,' বললে তাইস্কা।

চটপট পোষাক পরে নিল সে। আর আধাঘুমন্ত গ্রুশা চুল্লিতে কাঠ সাজাতে না সাজাতেই তাইস্কা ছুটে গেল আঙিনায়, হিমে জমাট জ্বালানি নিয়ে এল এক রাশ, তারপর বালতি নিয়ে চলে গেল জল আনতে।

চুল্লি ধরাতে বসল গ্রুশা। সরু সরু ভঙ্গুর কাঠিগুলো তেতে জ্বলে উঠল। কিন্তু জ্বলতে জ্বলতেই সব জ্বালানি গেল ফুরিয়ে, খানিকটা ধুঁইয়ে নিভে গেল চেলা কাঠগুলো। ফুঁ দিতে লাগল গ্রুশা। ধোঁয়ায় কড়কড় করে উঠল তার চোখ। রাগে প্রায় কান্না পেয়ে গেল গ্রুশার।

'আর তুই কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবি?' ভালেন্তিঙকাকে ধমকে উঠল সে, 'ভেবেছিস তোর কাজকর্ম নেই? যা, আরো জ্বালানি নিয়ে আয়!'

মাথায় রুমাল জড়িয়ে ভালেন্তিঙকা গেল বাইরে। গিয়েই থেমে গেল। আহ্‌ কী সুন্দর! হালকা নীল আকাশে গোলাপী মেঘ, শাদা শাদা চালের ওপর গোলাপী ধোঁয়া, বরফের স্তূপগুলোর ওপর রোদের ঝিকিমিকি। ঠাণ্ডা তেমন কড়া নয়, মুড়মুড়ে বরফ। বাতাসে অস্পষ্ট কীসের আমেজ, বসন্তের কথা মনে পড়ে যায়...

আঙিনায় গিয়ে ভালেন্তিঙকা বরফের তল থেকে এক রাশ জ্বালানি বার করলে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রুশা, অধৈর্যের সঙ্গে জ্বালানিগুলো কেড়ে নিলে সে:

'তোকে পাঠানো না মরণ! চুল্লি ওদিকে একেবারে নিভে গেল, আর ও এদিকে আসছে তো আসছেই। মারিয়া মাসি ঠিকই বলেছে, মাল তুলতেও পারে না, নামাতেও পারে না!'

নীরবে ভালেন্তিঙকা আড়চোখে চেয়ে দেখল গ্রুশার হালকা কটা চুলের চাঁদি আর টোল-খাওয়া তার অনাবৃত কনুইটার দিকে। অমন বিছছিরি চাঁদি আর অমন বিছছিরি হাত সে কখনো দেখে নি। আর গলাটাও কী খনখনে।

ভাবলে সে, 'দাশা মাসি ঘরে থাকলে গ্রুশা কখনো অমন ধমকাত না। মাকে ভয় পেত। এখন মা নেই কিনা...'

আর হঠাৎ কেমন ফাঁকা ফাঁকা, মনমরা, অস্বচ্ছন্দ লাগল বাড়িটা, যেন সূর্য ঢাকা পড়েছে মেঘে, যে আলোয় সে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা যেন নিভে গেছে।

'শীগগির করে সন্ধে নামুক, শীগগির ফিরে আসুক ও!'

কিন্তু দিনের তখন সবে শুরু, অপ্রত্যাশিত এক রাশ কষ্টের সবে আরম্ভ।

'তল-ভাঁড়ার থেকে আলু আন,' হুকুম দিলে গ্রুশা, 'এই নে বালতি, পুরো ভরে আনবি!'

'তল-ভাঁড়ার মানে?' জিজ্ঞেস করলে ভালেন্তিঙ্কা, 'কীসের তল-ভাঁড়ার?'

'নাও আবার কীসের তল-ভাঁড়ার! তল-ভাঁড়ারও ইনি চেনেন না!'

মেঝেতে লাগানো দরজাটা টেনে তুলল গ্রুশা। নিচের গর্তটায় উঁকি দিলে ভালেন্তিঙ্কা। ভেতরটা অন্ধকার। কী করে সে নামবে ওখানে? হঠাৎ যদি... কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে! আর আলুই বা ওখানে কোথায়?

'আ মলো যা!' চ্যাঁচাল গ্রুশা, 'তোর আলু আনতে আনতে যে চুল্লি পুড়ে যাবে।'

'নামতে পারব না,' ফিসফিসিয়ে বললে ভালেন্তিঙ্কা, 'ভয় করছে, ইঁদুর আছে হয়ত...'

'ইঁদুর ফিঁদুর কিচ্ছু নেই! স্রেফ ননীর পুতুল, আলুটাও আনতে পারিস না! উস্তিনিয়া বুড়ী ঠিকই বলেছিল, তোকে নিয়ে ভুগতে হবে।'

'ওখানে যে অন্ধকার...'

'বাতি জ্বালা।'

ছোট্ট একটা নীল বাতি জ্বাললে ভালেন্তিঙ্কা। বালতি নিয়ে নামল গর্তের ভেতর। বাতির আলোয় দেখা গেল গর্তের মেটে গা, কাঠের ঢাকনি দেওয়া নানা রকম টব, হাঁড়ি, পাতিল, কাঠের বাক্সে ডিম, তার ওপর ছাই ছেটানো। ডান দিকে ঢিপ হয়ে আছে বড়ো বড়ো আলুর স্তূপ, যেন বাছাই করা। পাশেই এক ধরনের হলদে শবজী। বালির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আছে গাজরের ঝুঁটিগুলো... তল-ভাঁড়ারটা দেখা গেল মোটেই তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়, বরং দিব্যি মজার!

'হল তোর?' ওপর থেকে চ্যাঁচাল গ্রুশা।

'এক্ষুণি! শুধু কোনগুলো নেব, বড়ো বড়ো নাকি ছোটো?'

'বড়োগুলো বইকি! ছোটোগুলো রাখা হয়েছে পোঁতার জন্যে। তাও জানিস না?'

'জানতাম না তো।'

'আচ্ছা মেয়ে বটে! সবাই জানে আর উনি জানেন না।'

আলু-ভরা বালতিটাকে ভালেন্তিঙ্কা তুললে খুব কষ্টেই, সিঁড়ির ধাপ থেকে ধাপে। ওপরের ধাপে গ্রুশা সেটাকে ধরলে।

'নে, এবার উঠে আয় জলদি! আমি বাছুরের খাবার তৈরি করছি, তুই সুপের জন্যে আলু ছাড়িয়ে ধুয়ে রাখ... আর তাইস্কাটাই বা কোথায় উধাও হল? মুরগীগুলোকে খাওয়াতে হবে, অথচ ওর পাত্তা নেই! চুল্লিটাও তেমন ধরছে না। কপালে তোদের দুঃখু আছে!'

ঘুম ভাঙল রমানকের। ঝাঁকড়া মাথাটা সে বার করলে:

'তৈরি হল সকালের খাওয়া?'

এই সময় গ্রুশার সাঁড়াশি ফসকে উলটে গেল কড়াইটা। তপ্ত ইঁটের ওপর শোঁ শোঁ করে উঠল জল।

'ঘুম ভাঙল বাবুর!' চেঁচিয়ে উঠল গ্রুশা, 'চোখ মেলতে না মেলতেই খাবার চাই!'

শেষ পর্যন্ত ফিরল তাইস্কা, রঙ হয়ে উঠেছে একেবারে গোলাপী, ফূর্তিতে টগবগ করছে। নীল চোখে তখনো হাসির ঝিলিক।

'জল আনতে কোন চুলোয় গিয়েছিলি তুই?' ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রুশা।

'কুয়োর ওখানে কত লোক তা জানিস?'

'কোনো লোকই নেই! স্রেফ বরফের মধ্যে খেলা জমিয়েছিলি! এই দ্যাখ, বালতির জলে পর্যন্ত বরফ জমেছে!'

তারপর ফিরল ভালেন্তিঙ্কার দিকে:

'কী, আলু ছোলা হল? এতক্ষণে মাত্র তিনটে?.. তাইস্কা, ছুরি নিয়ে ওই অকম্মাটাকে একটু সাহায্য কর।'

তাইস্কা কিন্তু ভালেন্তিঙ্কার কাছেও ঘেঁষল না।

'আমি তো বলেই দিয়েছি: বাইরের কাজ আমার, ঘরের কাজ তোমাদের। আমি গিয়ে বরং মুরগী খাওয়াব।'

এবং ফের দরজা বন্ধ করে উধাও হল। ভালেন্তিঙ্কার চোখ ভরে উঠল জলে। গ্রুশাকে তুষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু ছুরিটাও বাগ মানছিল না, আলুগুলোও হাত ফসকে ছুটে যাচ্ছিল।

'কখন যে ও আসবে?' ভাবলে ভালেন্তিঙ্কা, 'অন্তত তাড়াতাড়ি আসুক। তাড়াতাড়ি!'

আর কান পেতে রইল, ফটকের কাছে স্লেজের ক্যাঁচক্যাঁচানি উঠবে কখন, কখন শোনা যাবে পরিচিত, সুরেলা, সোহাগ-ভরা সেই গলা...

শেষ পর্যন্ত যা হোক ছোলা হল আলু। গ্রুশা সুপে যা যা দেবার দিয়ে চাপিয়ে দিলে চুল্লিতে। তারপর একটা চওড়া বালতিতে বাছুরের জাবনা ঢেলে বললে:

'বাড়িতে কত লোক অথচ বাছুরটাকে খাওয়াবার বেলায় কেউ নেই।'

'দাও, আমি খাওয়াচ্ছি,' ভয়ে ভয়ে বললে ভালেন্তিঙ্কা।

'বেশ খাওয়া গে, যদি পারিস।'

বাছুর খাওয়ানোর অভ্যেস নেই ভালেন্তিঙ্কার, কোথায় যে সেটা আছে, তাও জানত না। তাহলেও বালতি নিয়ে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল।

গ্রুশা বুদ্ধি করে বললে:

'রমানক, আমাদের নবাব বেটীকে দেখিয়ে দে গা! হামিং বার্ড না কী, তা সব জানে, কিন্তু বাছুর কোথায় থাকে, তা ও খুঁজেও পাবে না!'

'আমাদের বাড়িতে যে বাছুর ছিল না,' বললে ভালেন্তিঙ্কা।

'আচ্ছা লোক যা হোক!' তাচ্ছিল্যের সুরে টেনে টেনে বললে গ্রুশা, 'একটা বাছুরও পালতে পারে নি! কুঁড়ের বাদশা!'

ভালেন্তিঙ্কার চোখ ছলছল করে উঠল:

'মোটেই কুঁড়ে নয়! ফ্রন্টে যাবার আগে বাবা সারা দিন কারখানায় খাটত। ইঞ্জিনিয়র ছিল! মা-ও চাকরি করত!..'

'হয়েছে, হয়েছে, কথা শোনালে বটে!' বাধা দিলে গ্রুশা, 'কথা শোনাতে শোনাতে ওদিকে জাবনা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে... এই সেরেছে, দাদু আসছে যেন, কিন্তু সকালের খাওয়া যে আমার তৈরিই হয় নি। সব এই তোদের জ্বালায়!'

ভালেন্তিঙ্কা আর রমানক বেরিয়ে গেল।

'বাছুরটা থাকে আমাদের ভেড়াশালে,' বললে রমানক, 'এই যে দরজা। নাম ওর আগুনে, রঙটা ওই রকম কিনা! যা ঢুকে যা, তবে দেখিস, ভেড়া যেন না পালায়।'

ভেতরে ঢুকতেই ভেড়াগুলো খচমচ করে সরে গেল ওর কাছ থেকে। ভালেন্তিঙ্কাকে দেখে ভয় পেয়েছিল ওরা, আর ভালেন্তিঙ্কাও ওদের দেখে ভয় পেয়ে থেমে গেল চৌকাঠের কাছে।

উঁচু বেড়ার ঘেরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল হলুদ-শাদা রঙের একটি এঁড়ে। বেড়ার ফাঁকে সে মুখ ঘসছিল অধীর হয়ে আর ডাকছিল:

'হাম্বা, হাম্বা...'

ভালেন্তিঙ্কা এগিয়ে গেল বাছুরটার কাছে, সঙ্গে সঙ্গেই মায়ায় যেন ওর বুক গলে গেল।

'ঈস, কী সুন্দর! কী মিষ্টি! শাদা শাদা ঠ্যাং, যেন মোজা পরা! আর মুখখানা! আর চোখগুলো কী কালো, যেন কালোজাম!..'

দরজা খুললে ভালেন্তিঙ্কা। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই বাছুরটা ওকে ঠেলে লাফিয়ে বেরিয়ে ছুটল বালতিটার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই উলটে ফেললে সেটাকে। গলগল করে বইতে লাগল গরম জাবনা। সভয়ে ভালেন্তিঙ্কা তুলে নিলে বালতিটাকে, কিন্তু সেটা তখন শূন্য। এঁড়েটা রেগে ঢিঁস মারলে বালতির তলায়। গা থেকে চেটে নিলে খোলের টুকরো-টাকরা। কিন্তু জাবনা না পেয়ে গলা ছেড়ে ডাকতে লাগল।

'হতচ্ছাড়া!' প্রায় কান্না-ভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল ভালেন্তিঙ্কা, 'সব উলটে ফেলল! নিজেই হুমড়ে এসে উলটে ফেললে সব! যা এখন! যা, ঢোক!..'

বাছুর কিন্তু ঢোকবার নামও করলে না। অপ্রসর গোয়লটার মধ্যে সে ছোটাছুটি লাফালাফি শুরু করলে। ভেড়াগুলো ভয়ে দেয়ালে সেঁটে রইল। দেখা গেল ব্যাপারটা তার ভালোই লাগছে: ঘোঁৎঘোঁৎ করে, হাম্বাহাম্বা ডেকে সে তার শাদা শাদা চার পায়ে লাফাতে লাগল।

ভালেন্তিঙ্কা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এসে পৈঠায় বসে কাঁদতে লাগল।

'চলে যাব এখান থেকে!' বার বার বলতে লাগল সে, 'যাই ঘটুক চলে যাব! বয়ে গেল আমার... নয় বনের মধ্যে শীতে জমেই মরব!'

কাঁদা শেষ করে ভালেন্তিঙ্কা ঘরে ঢুকে ফাঁকা বালতিটা রাখলে। টেবিলে ভাপ উঠছে গরম আলুগুলো থেকে। গ্রুশা চুল্লির মুখ পরিষ্কার করছিল। জিজ্ঞেস করলে:

'খাওয়ালি?'

'না,' জবাব দিলে ভালেন্তিঙ্কা।

'না, মানে? তাহলে জাবনা কোথায়?'

'বাছুরটা উল্টে ফেলেছে!'

'উহ্, কিছুই ওকে দিয়ে হবে না! কিছুই ও পারে না! নবাব বেটী এসেছে এখানে! মারিয়া মাসি ঠিকই বলেছিল...'

'বললি কেন?' ফিসফিসিয়ে তাইস্কা বললে ভালেন্তিঙকাকে, 'না বললে ও জানতেই পেত না!'

'কিন্তু বাছুরটা? সারা দিন উপোস দেবে, এ্যাঁ?'

'দিলই বা! মরে তো যেত না!'

'তোর মতো কর্ত্রী হলে মরেই যেত!' হঠাৎ বলে উঠল দাদু, বড়ো ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছিল সে, ওদের আলাপটা তার কানে গিয়েছিল, 'গরু বাছুরকে ভালোবাসতে, মায়া করতে হয়। দেখছিস তো, শহুরে মেয়ে, কিন্তু মায়া আছে। আর তোর কাছে: "উপোস দিলই বা!" নে গ্রুশা, জাবনা বানিয়ে তুই নিজেই নিয়ে যা।'

গ্রুশা গজগজ করলে, তাহলেও নিয়ে গেল জাবনা। ব্যাপারটা মিটে গেল।

কিন্তু কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল ভালেন্তিঙকার। এক্ষুণি হয়তো গ্রুশা একটা ঝঞ্ঝাটে কাজের ভার চাপাবে ফের। তাইস্কা তাকে সাহায্য করার বদলে হেসে উঠে ছুটবে রাস্তায়, তার পেছু পেছু রমানক। দাদু গোমড়া-মুখো, অমিশুক, তার কাছে তো যাওয়াই যাবে না... ঈস, সন্ধে আসতে কত যে দেরি! আর যদি সন্ধেতেও সে না আসে?..

প্রাতরাশের পর ঘর গোছগাছ শুরু হল। মেঝে ঝাঁট দেবার ভার পড়ল ভালেন্তিঙকার ওপর। তবে এটা সে পারে। বাড়িতেও অনেকবার সে ঝাঁট দিয়েছে। বড়ো ঘর, রান্নাঘর, দুই-ই ঝাঁট দিলে সে, আবর্জনা সরাল অলিন্দ থেকে।

সকালটা ছিল ঝকমকে, কিন্তু দিনের বেলাটা দাঁড়াল স্যাঁৎসেঁতে, ধূসর, ঝোড়ো। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল ছাদ বেয়ে। ন্যাড়া ডালগুলোর মধ্যে চিরিকপিরিক করছিল চড়ুইগুলো। কী ঠাণ্ডা, গোমড়া দিন! কী ঠাণ্ডা আর মনমরাই না লাগছে ভালেন্তিঙকার! কারো ভালোবাসা পাওয়া ওর দরকার, খুবই দরকার, কেউ ওকে ভালোবাসুক, সোহাগ করুক, কেউ ওকে শুধোক: 'বেড়াতে যাবি?' কিংবা 'খিদে পেয়েছে?' কেউ ওকে বলুক: 'ওভারকোট না পরে বাইরে যাস নে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে!' ভালোবাসা না পেলে কেউ বাঁচতে পারে কখনো?..

সূর্যটা এখন আকাশের কোথায়? মধ্যি গগনে, নাকি নেমে এসেছে বনগুলোর মাথায়? মেঘের ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। একটু কেঁপে উঠে বাড়ির ভেতরে ঢুকল ভালেন্তিঙকা।

ভেতরটা এতই চুপচাপ যে কেমন সন্দেহ লাগে। গ্রুশা, তাইস্কা আর রমানক টেবিল ঘিরে বসে মুখ গুঁজে কী যেন দেখছিল। কিন্তু ভালেন্তিঙকা চৌকাঠ পেরতেই তারা সভয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। তাইস্কা টেবিল থেকে কী একটা জিনিস নিয়ে তার অ্যাপ্রনের নিচে ঢুকিয়ে দিলে। তিনজনেই ভালেন্তিঙকার দিকে তাকালে কেমন যেন বিব্রত ভাবে, হয়ত বা উপহাসের দৃষ্টিতে। ভালেন্তিঙকার চোখে পড়ল তাইস্কার অ্যাপ্রনের তল থেকে উঁকি মারছে একটা হলদে বেল্ট।

'আমার ব্যাগ নিয়েছ তোমরা,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কেন নিলে? দিয়ে দাও।'

'ওহ, বড়ো যে দেখি চ্যাঁচানি,' হাসতে হাসতে বললে তাইস্কা, 'দেব না!'

'দিয়ে দে,' তাচ্ছিল্যভরে বললে গ্রুশা, 'ভারি এক সম্পত্তি! ভেবেছিলাম দেখবার মতো কিছু থাকবে। কোথায়, শুধুই কতকগুলো ছবি।'

'নে,' বললে তাইস্কা।

ভালেন্তিঙ্কা হাত বাড়ালে, কিন্তু চট করে ব্যাগটা সরিয়ে নিলে তাইস্কা। রমানক তাইস্কা দুজনেই হেসে উঠল।

'নে, আমাকে ধর, ধরতে পারলে দেব!' বলেই তাইস্কা ছুটে গেল রান্নাঘরে।

ভালেন্তিঙ্কা কিন্তু তার পেছনে ছুটল না। কোণের জানলাটার কাছে এসে সে চেয়ে রইল শার্সির বরফ-গলা আঁকিবুঁকিগুলোর দিকে।

তাইস্কা তখন কাছে এসে নীরবে এগিয়ে দিলে ব্যাগটা। ভালেন্তিঙ্কা সেটা নিলে, কিন্তু জানলা থেকে নড়ল না। কী আস্পর্ধা ওদের যে ব্যাগটা নিল? গ্রুশার স্কুলের ব্যাগ হাতড়ে কি ও দেখেছে কখনো? দেখতে গেছে কী তাতে আছে?

জানলায় কী ছাই-ছাই গোমড়া-মুখো দিন!

কিন্তু কে ওখানে? বরফের ওপর যেন স্লেজের ক্যাঁচক্যাঁচ শোনা গেল। ঠিকই তাই, কে যেন বাড়ির দিকেই আসছে।

'ওই বোধ হয় মা এল,' বললে গ্রুশা।

ছুটে বাইরে গেল ভালেন্তিঙ্কা, রুমালটাও মাথায় জড়ালে না।

'ঠিক তাই!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ঠিক! এসে গেছে!'

দারিয়া মাসির কাছে ছুটে গিয়ে ভালেন্তিঙ্কা নীরবে তার স্যাঁতসেঁতে ওভারকোটটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরলে।

'এ কী, কোট না পরেই ঠাণ্ডায় ছুটে এলি যে,' ধমকে উঠল দারিয়া মাসি, 'শীগগির বাড়ি ঢোক!'

তা ধমকাক। ভালেন্তিঙ্কার তাতে একটুও ভয় করছে না। সে তো দেখতে পাচ্ছে কী স্নেহে ঝিকমিক করছে দারিয়া মাসির নীল চোখদুটো, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটে লাল হয়ে ওঠা মায়াময় মুখখানা কীভাবে ঝলমল করছে হাসিতে। ভালেন্তিঙ্কার অনিষ্ট করায় সাহস আজ আর কেউ পাবে না!

জানলায় বসন্ত। দেখা গেল দাদু তেমন ভয়ঙ্করও নয়, রাগীও নয়

গরম হয়ে উঠতে লাগল সূর্য। বরফ গলতে থাকায় ভেজা ভেজা হয়ে উঠল বার্চগাছগুলো, সরু সরু ডাল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে লাগল ঝলমলে জলবিন্দু। হঠাৎ কোথা থেকে রুক পাখিগুলো উড়ে এল গাঁয়ে। গাছের ন্যাড়া ন্যাড়া ডগায় বসে চেঁচামেচি জুড়ল তারা, খোঁচাতে লাগল কালচে হয়ে আসা বরফ ঢাকা রাস্তায়।

'বরফ ফেটে যাচ্ছে,' বললে দাদু, 'এবার ডাগ-আউটগুলোয় কষ্টে পড়বে সৈন্যরা, ভিজে স্যাঁৎস্যাঁৎ করবে।' তারপর নিশ্বাস ফেললে, 'এহ্ হিটলার না পিশাচ! গোটা দুনিয়াটাকে ভোগাচ্ছে।'

'বরফ ফেটে যাচ্ছে...' ভাবলে ভালেন্তিঙ্কা, 'বরফ আবার ফেটে যায় কেমন করে?'

কল্পনায় তার ভেসে উঠল মস্তো এক বরফের ঢিবি, সশব্দে সেখান থেকে ধসে পড়ছে বরফের চাঙ। কিন্তু কোথায় সেই ঢিবিটা? জিজ্ঞেস করবে নাকি?.. তবে দাদুর কাছে কি আর জিজ্ঞেস করা যায়!

ভালেন্তিঙ্কা প্রায়ই গিয়ে দাঁড়াত অলিন্দে, তাকিয়ে দেখত, শুনত... দেখত কীভাবে মেঘ ভেসে যাচ্ছে আকাশে, হাওয়ায় দুলছে বার্চগাছের লম্বা লম্বা বেণী, মুরগীর খাবারগুলো খুঁটে খুঁটে লাফাচ্ছে চড়ুইগুলো। শুনত গাছগুলোয় বাতাসের শনশন, পাশের কুঞ্জ থেকে ভেসে আসা সিস্কিন পাখির অস্পষ্ট গান।

অবুঝ নতুন কী একটা গন্ধে ভরে উঠেছিল বাতাস, ভালেন্তিঙ্কাকে তা অস্থির করে তুলত, কোথায় যেন ডাকত হাতছানি দিয়ে...

মাঝে মাঝে তাইস্কা তাকে ঠেলত বেড়াতে যাবার জন্যে:

'চল, মেয়েগুলোর কাছে যাই! চল, ঢিপিটায় যাই!'

ভালেন্তিঙ্কা যেত না। ভয় হত, ছেলেগুলো হয়ত ধরে পিটবে। মেয়েগুলোকেও ভয় হত: হাসাহাসি করবে তার হুড, তার খাটো ফ্রক নিয়ে। আর প্রায়ই দূর থেকে, বাড়ির কাছ না ছেড়ে সে দেখত কীভাবে ঢিপিটায় মাতামাতি করছে ছেলেমেয়েগুলো, বরফ নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছে।

একদিন রোদ-ভরা এক সকালে দাদু গুদাম থেকে গম, যব, আর মটর শুঁটির বীজ এনে কতকগুলো ডিশের মধ্যে বুনলে। বীজগুলো ভালো কিনা, বোনার উপযুক্ত কিনা, সেটা দেখতে চাইছিল সে। দাদু ছিল গুদাম জমাদার, বোনার জন্যে ভালো বীজ যোগানো ছিল তার প্রধান কাজ।

প্রত্যেক দিন ডিশগুলোকে দেখত ভালেন্তিঙ্কা। অঙ্কুর বেরয় নি কোথাও? গ্রুশার প্রায়ই নজরে পড়ত যে ভালেন্তিঙ্কা ডিশগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে ভেজা মাটির দিকে চেয়ে আছে।

'কী দেখিস তুই?' অবাক হল গ্রুশা, 'কী দেখবার আছে ওতে? খ্যাপা একেবারে!'

একদিন ধূর্ত-ধূর্ত চেহারায় তাইস্কা এল ডিশগুলোর কাছে। বললে:

'যা বেরবার নয়, তা বেরয় না! হয়ত সত্যিই বেরবে না?' তারপর গলা নামিয়ে প্রস্তাব দিলে, 'শোন ভালেন্তিঙ্কা, তুই একবার খুঁড়ে দ্যাখ কল আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে বেরবে।'

ভালেন্তিঙ্কার নিজেরাই ইচ্ছে হচ্ছিল অন্তত একটা বীজ খুঁড়ে দেখে। কিন্তু ভারি দুষ্টু-দুষ্টু একটা হাসি ঝিলমিল করছিল তাইস্কার চোখে। রমানক ভয়ানক সতর্ক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করলে, খুঁড়ে দেখবে ভালেন্তিঙ্কা, নাকি দেখবে না।

শেষ পর্যন্ত রমানক আর পারলে না। বলে ফেললে:

'খুঁড়িস না, দাদু ভয়ানক চটে যাবে!'

'কেলিয়ে দিলে,' চেঁচিয়ে উঠল তাইস্কা, 'তোর নাক গলাতে আসবার কী আছে? তোর ওপর চটত? তোর ওপর, না?'

রমানককে জিভ ভেঙিয়ে চলে গেল তাইস্কা।

'গত বসন্তে আমি খুঁড়ে দেখেছিলাম,' বললে রমানক, 'আর এমন আমার চুল টেনে ধরেছিল দাদু! ও যে সব গুণে রাখে।'

সভয়ে রমানকের দিকে চাইলে ভালেন্তিঙ্কা। সর্বনাশ, দাদুর কাজ পণ্ড হলে কী হত!

সেদিন থেকে সে ডিশগুলোর কাছেও ঘেঁষত না। যখন খুবই একঘেয়ে লাগত, তখন ঘরের কোণে গিয়ে বসত, হলদে ব্যাগটা থেকে এক গোছা ছবি বার করে দেয়ালের কাছে সারি দিয়ে সাজাত। ছবিগুলো তার অনেকদিনকার জোগাড় করা। কোনোটা পত্রিকার পাতা থেকে কেটে নেওয়া, কোনোটা খেলনা বা ছিট কাপড়ের বিনিময়ে সখীদের কাছ থেকে যোগাড় করা, ভালো পিকচার পোস্টকার্ড এলে মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া।

ভালেন্তিঙ্কা যখন তার ছবিগুলোর সামনে বসে কী দেখত আর আপন মনে বিড়বিড় করত, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাত দারিয়া মাসি। কার সঙ্গে কথা বলছে সে, কী দেখছে?

আর ভালেন্তিঙ্কা ওদিকে ভাবত: শালুকের ওই গোল পাতাটার ওপর বসে আছে এইটুকুনি একটি মেয়ে—দুইমোভচ্‌কা। দুইমোভচ্‌কা নয়, ভালেন্তিঙ্কা নিজেই পাতার ওপর বসে কথা কইছে মাছেদের সঙ্গে...

কিংবা ওই একটা কুটির। ভালেন্তিঙ্কা এল দরজার কাছে। কে থাকে কুটিরে? নিচু দরজাটা খুলে ঢুকল ভালেন্তিঙ্কা। দেখে, এক পরমাসুন্দরী পরী বসে বসে সোনার সুতো কাটছে। ভালেন্তিঙ্কাকে দেখে উঠে দাঁড়াল পরী: 'আয় মেয়ে, আমি অনেক দিন তোর পথ চেয়ে আছি!'

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কেউ ঘরে ঢুকলেই খেলাটা তার থেমে যেত। নীরবে ছবিগুলো গুটাত সে।

একদিন ভালেন্তিঙ্কা আর পারল না, সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে গেল ডিশগুলোর দিকে।

'আরে বেরিয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'পাতা বেরিয়েছে, রমানক এই দ্যাখ!'

এগিয়ে এল রমানক:

'সত্যিই তো!'

কিন্তু ভালেন্তিঙ্কার মনে হল রমানক যেন যথেষ্ট অবাক বোধ করল না, যথেষ্ট আনন্দ দেখাল না। তাইস্কা কোথায়? তাইস্কা নেই। একা গ্রুশা বসে আছে বড়ো ঘরে।

'গ্রুশা, আয়, আয় দেখে যা!'

কিন্তু মোজা বুনছিল গ্রুশা, আর ঠিক এই সময়েই ঘরগুলো গুণছিল সে। রেগে মুখ ঝামটা দিলে সে:

'ভারি দেখানোর জিনিস পেলেন! কী আছে দেখবার!'

অবাক লাগল ভালেন্তিঙ্কার: লোকের এতে আনন্দ হচ্ছে না কেন? দাদুকে বলতে হবে, সেই তো বুনেছিল!

এবং তার বরাবরের ভয় ভুলে সে ছুটে গেল দাদুর কাছে।

আঙিনায় দাদু নর্দমা কাটছিল, বসন্তের বরফ গলা জল তা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, উঠোন ভাসাবে না।

'দাদু চলো দেখবে! তোমার ডিশগুলোয় পাতা ফুটেছে, ঘাস বেরিয়েছে!'

দাদু তার ঝোঁপ-ঝোঁপ ভুরু তুলে তাকাল তার দিকে, আর এই প্রথম বার দাদুর চোখদুটো দেখতে পেল ভালেন্তিঙকা: নীল, টলটলে, হাসি-হাসি। আর মোটেই বদরাগী মনে হল না দাদুকে, মোটেই ভয়ঙ্কর নয়।

'তাতে তোর এত আনন্দ কেন?' জিজ্ঞেস করলে দাদু।

'জানি না,' বললে ভালেন্তিঙকা, 'এমনি।'

শাবলটা সরিয়ে রাখল দাদু।

'তা বেশ, চল, গিয়ে দেখি।'

অঙ্কুরগুলো গুণলে দাদু। মটর শুঁটিগুলো ভালোই বেরিয়েছে। যবও মন্দ নয়। কিন্তু গমগাছগুলো বেরিয়েছে ফাঁকা ফাঁকা: এ বীজে চলবে না; নতুন বীজ দরকার।

আর ভালেন্তিঙকার যেন উৎসব লাগল। দাদুকে আর ভয়ঙ্কর মনে হয় না, জানলায় বসানো গাছগুলোর সবুজ দিনদিনই গাঢ় হয়ে উঠল, দিনদিনই উজ্জ্বল।

বাইরে তখনো বরফ, আর জানলায় রোদ্দুর, সবুজ—কী আনন্দ! যেন একটুকরো বসন্ত ফুটে উঠেছে সেখানে!

বাড়ন্ত সংসার। ঘরে নতুন বাসিন্দা

মা আজ থেকে থেকেই ভেড়াশালে গিয়ে কী দেখছে। যাচ্ছে আর দেখছে। এমন কি বেশ রাতে, সবাই যখন শুয়েছে, তখনো ভালেন্তিঙকার কানে গেল, বাতি জ্বালছে মা, ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে ফের চলে গেল গোয়ালে।

এবার সে ফিরল চট করেই, আর এসেই দাদুকে জাগিয়ে দিলে:

'বাবা, ও বাবা, ওঠো, আমায় একটু সাহায্য করো!'

তারপর ফের চলে গেল। দাদুও চট করে উঠে চলে গেল তার পেছন পেছন।

শঙ্কিত হয়ে উঠল ভালেন্তিঙকা। কী হল? সেও তাড়াতাড়ি করে ফ্রক পরে নিলে, বলা যায় না, যদি ছুটে পালাতে হয়?

বড়ো খাটটায় নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে দুই মেয়ে। নাক ডাকাচ্ছে রমানক। কিন্তু বাড়িতে যখন এমন একটা দুর্ভাবনা, তখন ঘুমচ্ছে কেন সবাই?

কিছুক্ষণ পরে আঙিনায় দরজা খোলার শব্দ কানে এল, বারান্দায় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। ওটা মায়ের পায়ের শব্দ, ওটা দাদুর, সেই সঙ্গে আরো একটা খুটখুট আওয়াজ...

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল মা আর দাদু, তাদের পেছন পেছন ছুটে এল মস্ত একটা কালো ভেড়ী। চটে ঢাকা আরো কী একটা যেন বয়ে আনছিল মা। চটটা খুলতেই ভালেন্তিঙকার চোখে পড়ল ছোট্ট ছোট্টো ভেড়ার বাচ্চা, গা তাদের তখনো ভেজা।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল সে।

'আরে, কী ছোট্ট!'

একে একে তিনটে বাচ্চা। পাগুলো ফাঁক ফাঁক করে ছড়ানো, কোনো রকমে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ভেড়া-মা এগিয়ে এসে তাদের গা চাটতে লাগল খড়খড়ে জিভে। চাটছিল এমন রোখে যে বাচ্চাগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, উল্টে পালটে পড়ে যাচ্ছিল।

'নে, হয়েছে, হয়েছে!' মা বললে, 'চেটে সাফ করলি, এখন থাক! ওদের বরং একটু দুধ দে!'

ভেড়ীটাকে ধরে রাখল দাদু, আর বাচ্চাগুলোকে মা টেনে আনলে বাঁটের কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই চুষতে শুরু করলে ওরা। তবে খুব উতরাল না। কালো দুটো বাচ্চা দুধ টানতে লাগল আর শাদাবুক তৃতীয় বাচ্চাটা চারিদিকে ছোটাছুটি করে ডাকতে লাগল সরু গলায়। মা তখন একটা কালো বাচ্চাকে সরিয়ে নিয়ে শাদাবুকটাকে বাঁট ধরিয়ে দিলে। কিন্তু কালোটা হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাইল। আর মা ওকে ছেড়ে দিতে না দিতেই সে ফের ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে শাদাবুকটাকে।

'আচ্ছা পাজী তো! এটাকে দেখছি আলাদা খাওয়াতে হবে।'

বোতলে দুধ ঢেলে মা রবারের চুষি এ'টে দিলে মুখে।

'সত্যিই খাবে নাকি?' অবাক লাগল ভালেন্তিঙকার, 'চুষি চুষে খেতে পারবে? কোলের ছেলের মতো?'

'তা কোলের ছেলে নয়ত কী?' হাসল মা, 'শুধু ভেড়ার ছেলে।'

বাচ্চাটা প্রথমে চুষি ধরতে চাইছিল না, কিন্তু জিভে এক ফোঁটা দুধ পড়তেই চুকচুক শব্দ করে চুষতে লাগল।

'দাও, আমি খাওয়াই,' মিনতি করলে ভালেন্তিঙকা, 'দাও না আমায়!'

মা ওকে বোতলটা দিলে।

'দ্যাখো, দ্যাখো খাচ্ছে কেমন!' খুশি হয়ে উঠল ভালেন্তিঙকা, 'চুষে চুষে খাচ্ছে! ঈস, কী সুন্দর মুখখানা! কী রকম বোকা বোকা মিষ্টি চোখ!..'

ভালেন্তিঙকা বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল তার শাদাটে গোল কপালের ওপর।

মা আর দাদু পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করে নীরবে হাসল।

'হয়ত সত্যি মন বসবে,' শোবার সময় ক্যাঁককেঁকে গলায় বিড়বিড় করলে দাদু, 'আমাদের গুলোর তো জীবজন্তুর ওপর তেমন টান নেই, আর এটা দ্যাখো দিকি...'

'থাক, চোখ দিও না,' আস্তে করে বললে মা।

কথাগুলো ভালেন্তিঙকা শুনলেও কান দেয় নি, কেননা ভেড়ার বাচ্চাগুলো নিয়ে তখন সে আনন্দে দিশেহারা। এ রকম ভেড়ার ছানা যে সে আগে দেখেছে কেবল ছবিতে!

ভেড়াশালে ভালেন্তিৎকার বন্ধুলাভ

ঘরেই রয়ে গেল ছানাগুলো। মার ভয় ছিল ভেড়াশালে থাকলে হয়ত ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে, ভেড়ার খুরে চাপাও পড়তে পারে।

ছানাগুলো থাকায় ভারি আনন্দময় হয়ে উঠল বাড়িটা। দিনে বার কয়েক করে ভেড়া-মা এসে ওদের দুধ খাইয়ে যেত। শাদাবুকটার দুধ জুটত সবচেয়ে কম। তবে তার জন্যে উষ্ণ দুধে ভরা বোতল তৈরি থাকত, তৈরি থাকত ভালেন্তিৎকাও। বাচ্চাটা অচিরেই বোতল আর ভালেন্তিৎকা, দুয়েতেই অভ্যস্ত হয়ে গেল। তার মুখে আর চুষি ঢুকিয়ে দিতে হত না, নিজেই সে এসে মুখ লাগাত, চুষত, গুঁতো মারত, দুধ না এলে যেভাবে পালানে গুঁতো মারে ছানারা।

খাওয়ার পর খেলতে শুরু করত বাচ্চাগুলো। পরস্পর তাড়া করে ছুটাছুটি লাগত সব, রান্নাঘর থেকে বড়ো ঘরে, বড়ো ঘর থেকে রান্নাঘরে। শক্ত হয়ে ওঠা ছোট্ট ছোট্ট খুরগুলোয় টুকটুক শব্দ হত, যেন কাঠের মেজের ওপর মটরের দানা পড়ছে। লাফালাফি করত বাচ্চাগুলো, ঝাঁপাত, ছুটে গিয়ে শিঙ না ওঠা মাথা বাড়িয়ে গুঁতোগুঁতি করত, তারপর আবার দৌড়ত বড়ো ঘর থেকে চুল্লি, চুল্লি থেকে বড়ো ঘর।

'টের পাবে 'খন,' ধমক দিত মা, 'ছুটে ছুটে ফের খিদে পেয়ে যাবে!'

রমানক চুপ করে থাকতে পারত না, কোনো একটা বাচ্চাকে ধরে কোলে নেবার ভারি ইচ্ছে ওর। বাচ্চাগুলো কিন্তু ধরা দিত না, রমানক ছুটত তাদের পেছন, ছুটতে গিয়ে পড়ে যেত, তার দেহের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যেত বাচ্চাগুলো, হেসে উঠত মেয়েগুলো, ভারি সোরগোল লেগে যেত বাড়িতে, একেবারে যেন হাট বসে যেত!..

ছানাগুলোর জন্যে ভালেন্তিৎকার আহ্লাদের সীমা ছিল না। বিশেষ করে নিজেরটির জন্যে, শাদাবুকটি। বাচ্চাটাও তাকে ঠিক চিনতে পারত, তাতে ভারি গর্ব হত ভালেন্তিৎকার। তার ভেজা ভেজা মুখখানায়, কপালের শাদা ছোপটায়, তার সাটিনের মতো নরম, উষ্ণ কানদুটিতে চুমু খেত সে, আর যা মনে আসত কেবলি সোহাগের কথা বলে যেত।

বাচ্চাগুলোকে প্রথমে ঘরের মধ্যে লাফালাফি ছোটাছুটি করতে দিত মা, তারপর সরিয়ে দিত রান্নাঘরের মাচার তলে, খোঁয়াড়ে। তাদের দেখা শোনার ব্যাপারে ভালেন্তিৎকা সাহায্য করত মাকে, তারপর নিজেই ও কাজটা পুরোপুরি টেনে নিলে: ভেড়া-মা'র কাছে যাবার জন্যে ছেড়ে দিত, আবার তাড়িয়ে ফেরত আনত, বিচালির নোংরা বিছানা সাফ করত, নতুন বিচালি বিছাত। আর উষ্ণ আধো অন্ধকারে ছানাগুলো যখন আরামে ঝিমুত, তখন প্রায়ই সে কাছে বসে ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকত মুগ্ধ হয়ে।

এক সপ্তাহ কাটল। বড়ো হয়ে উঠল বাচ্চাগুলো, শক্ত হল। ফুঁয়ো-ফুঁয়ো পাকে কুঁকড়ে উঠল তাদের ঘন লোম। কালো দুটোর মাথায় তো স্পষ্টই দেখা গেল পাকানো শিঙ।

'এবার বাছারা ভেড়াশালে যাবার সময় হয়েছে,' বললে মা, 'এখানে বসে বসে ঘর নোংরা করা আর গুঁতোগুঁতি ঢের হয়েছে!'

বাচ্চাগুলোর বাসাবদলে সাহায্য করলে ভালেন্তিঙ্কা। কী আফশোস! ওখানে ওদের লাফালাফি করার জায়গা কোথায়? বড়ো বড়ো ভেড়াগুলো ওদের চিঁসবে। আর ওই হলদে দামড়া এঁড়েটা যদি ছাড়া পেয়ে তাণ্ডব লাগায় ভেড়াশালে?

'ভাবনা নেই, ভাবনা নেই,' বললে মা, 'বোকাটাকে আমরা খুলে দেব না। তবে ইচ্ছে তো ওর হয়: ঈস, চাইছে কেমন!'

এঁড়েটা তার বড়ো বড়ো ভেজা চোখ মেলে ফাঁক দিয়ে ভেড়ার দিকে তাকিয়ে দেখছিল শান্তভাবে। এই শান্তশিষ্টটির জন্যে একবার তাকে কী নাকাল না হতে হয়েছিল, সেটা ভালেন্তিঙ্কার মনে পড়ল। তাহলেও কাছে এগিয়ে গেল সে, তাকিয়ে দেখল তার ভোঁতা-ভোঁতা মজাদার মুখখানা, তার পশমের মতো চিকন, নরম গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিলে সে, আর সঙ্গে সঙ্গেই সব রাগ তার জল হয়ে গেল।

'আয় আগুনে, আয় রে সোনা, আয়, তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই।'

ভেড়াশাল থেকে বেরুবার সময় সে মাকে বললে:

'আমিও তোমার সঙ্গে আগুনেকে খাওয়াব, কেমন?'

'কার সঙ্গে?'

মাথা নিচু করলে ভালেন্তিঙ্কা। সে জানত যে মার ভারি ইচ্ছে যে সে বলুক: 'তোমার সঙ্গে, মা!' কিন্তু মা বলে সে তাকে ডাকতে পারল না। মুখ দিয়ে বেরবেই না!

'তা বেশ,' নিশ্বাস ফেলে বললে মা, 'তোর যখন ইচ্ছে, তখন দুজনে মিলেই খাওয়াব।'

সেদিন থেকে ভালেন্তিঙ্কা গোয়ালে যেতে লাগল মার সঙ্গে। মা তাকে দেখিয়ে দিলে কীভাবে দরজা খুললে এঁড়েটা বেরতে পারবে না, কীভাবে বালতি রাখলে তা উলটে যাবে না, কীভাবে ধরে রাখলে শিঙ দিয়ে গুঁতোতে পারবে না এঁড়েটা। শিঙদুটো তার এর মধ্যে উঠেছে একেবারে আসল ষাঁড়ের মতো।

প্রথম প্রথম আগুনেকে খানিকটা ভয়ই লাগত ভালেন্তিঙ্কার, এমন আনাড়ী, এমন নীরেট, এমন হুটপাট করে, ঠেলে, উল্টে ফেলে দেয় আর কি। আর একটু অন্যমনস্ক হলেই ভালেন্তিঙ্কার ফ্রকের খুঁট টেনে চিবতে শুরু করে দেবে। একেবারে বিদ্‌ঘুটে। একদিন সে তো স্রেফ মুখটাই চেটে দিলে ভালেন্তিঙ্কার, যেন ঘসে দিলে উখো দিয়ে।

'ওরে বাবা রে, আমায় চেটে দিলে!' চ্যাঁচাতে গিয়ে হেসে উঠল ভালেন্তিঙ্কা।

মাও হাসল:

'দেখছিস তো কেমন তোকে ভালোবাসে! ড্যাবরাচোখোটা যে জানে কে ওকে জাবনা দেয়।'

ভেড়ার বাচ্চাগুলো সরিয়ে দেবার পর বাড়িখানা কিন্তু কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল ভালেন্তিঙ্কার কাছে, কেমন একঘেয়ে। তাইস্কা আর রমানক খেলতে চলে যেত বাইরে। ঘরকুনো গ্রুশা হয় পড়াশুনা করত, নয় মোজা বুনত। তখন ভালেন্তিঙ্কা ফের সাজিয়ে বসত তার ছবিগুলো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আর ফিসফিস করত কীসব, যেন অদৃশ্য কাদের সঙ্গে কথা কইছে।

ভালেন্তিঙ্কার গল্প বলা

খোঁড়া হাঁসের গল্পটা পড়ে শোনাচ্ছিল গ্রুশা। হাঁসটা যখন কন্যে হয়ে গেল, সেই পর্যন্ত এসে গ্রুশা পাতার কোণটা মুড়ে বই বন্ধ করল।

'করছিস কী!' বললে রমানক, 'তারপর কী হল?'

'তারপর আমাদের এখনো পড়া দেয় নি,' বললে গ্রুশা। তারপর আড়ি ভেঙে আরামের হাই তুললে, 'এখন যে একটা ঘুম হবে না!'

বাড়ির বাইরেটা চ্যাটচেটে—কখনো বৃষ্টি, কোথাও বরফ। বেরনো দায়। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে তাইস্কা, ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে সে হিশেব করলে: আলেঙ্কার কাছে যদি সে এখন দৌড়ে যায় তাহলে কি একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে যাবে, নাকি ততটা জবজবে হবে না?

নিজের কোণটিতে বসেছিল ভালেন্তিঙ্কা, সামনে তার ছবিগুলো। রমানক তার কাছে এসে বসল, জিজ্ঞেস করলে:

'কী এটা, জাহাজ?'

'হ্যাঁ,' অনিচ্ছায় উত্তর দিলে ভালেন্তিঙ্কা।

'কোথায় যাচ্ছে?'

'সারা পৃথিবী ঘুরতে।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল রমানক।

'সে কী! সারা পৃথিবী? জাহাজটা এখন কোথায়? এটা কী জাহাজ? কে আছে জাহাজে? সারা পৃথিবী ও ঘুরছে কেন?'

'জাহাজে করে যাচ্ছে মাগেল্লান,' বললে ভালেন্তিঙ্কা।

একবার মার কাছে সে বড়ো বড়ো পর্যটকদের গল্প শুনেছিল, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করেছিল যারা। এই সব পর্যটকদের ছবি সমেত মোটা মোটা বই ছিল তাদের বাড়িতে। এর মধ্যে কেন জানি খোঁড়া মাগেল্লানের গল্পটা তার মনে ছিল বেশি। কীভাবে সে সারা পৃথিবী ঘুরছে সাগরে, লড়াই করেছে বুনোদের সঙ্গে, মারা গেছে। আর ছবিটায় যা আঁকা ছিল, সেটা কার জাহাজ তা জানা না থাকলেও সে ধরে নিলে এটা মাগেল্লানের জাহাজ।

'দেখছিস কেমন জল ফুঁসে উঠছে? এতো আর নদী নয়, এ যে সমুদ্র। মাঝি মাল্লা সব আছে জাহাজে। তারা চ্যাঁচাচ্ছে, "আর জাহাজ চালাতে রাজী নই, বাড়ি ফিরতে চাই আমরা!" কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপটেন। হাঁটে আর খোঁড়ায়। তবে খোঁড়া হলে কী হবে, দুর্দান্ত সাহসী। বললে, "চুপ করো সবাই! বাড়ি আমরা ফিরছি না! আরো এগিয়ে যাব আমরা! যাব সোনার দ্বীপে। সোনার ধুলোয় তা ভরা, নদীগুলোয় মণিমুক্তা ছড়ানো, যত খুশি নিও!"'

রমানককে শোনাল ভালেন্তিঙকা কীভাবে সোনার দ্বীপে পেঁছল নাবিকেরা, তাল খেজুরের গাছে সেখানে সোনার পাতার ঝনঝন, ফুলের পেয়ালার মধ্যে মণিমুক্তোর ঝলমল, রাতে রঙচঙে বাতি নিয়ে মাঠের ওপর ওড়া উড়ি করে ক্ষুদে ক্ষুদে প্রেত...

এ কথাটা অবশ্য মা বলে নি। এটা ও নিজেই এখুনি বানিয়ে নিলে। তাতে কী হল? রমানকের তো শুনতে ভালো লাগছে!

তাইস্কাও শুনছিল এই অপরূপ কাহিনীটা। নীল সমুদ্রের দিকে তাকাল সে, দূরে দেখা যাচ্ছে সবুজ খেজুরগাছ, জাহাজটার পাশদুটো চওড়া, অজস্র পাল খাটানো তাতে।

তার মনে হল যেন সে দেখতে পাচ্ছে খোঁড়া ক্যাপটেন হাঁটছে, দূর দ্বীপের উপকূলে সোনার ঝিকিমিকি যেন চোখে পড়ল, কানে এল স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর মর্মর, গর্তে তার জ্বলজ্বলে মণিমুক্তা...

‘আর এই ছবিটা দেখছিস? বুনোরা আক্রমণ করে ওদের...’

বই থেকে কেটে নেওয়া একটা ছবি দেখাল ভালেন্তিঙকা, তাতে দেখা যাচ্ছে নগ্ন একদল লোক তীর ছুঁড়ে যাদের আক্রমণ করছে তাদের পরনে স্পেনীয় পোষাক।

‘কে কাকে মারলে?’ জিজ্ঞেস করলে রমানক।

‘মাগেল্লানকে খুন করে ওরা। দেখছিস, মাগেল্লান পড়ে যাচ্ছে?’

‘নে, সবটা বল,’ হঠাৎ এসে নাক ঢোকাল তাইস্কা, ‘সবটা পর পর বলে যা। কারা এরা? রুশী নাকি জার্মান?’

‘কী রে তুই!’ হাসল ভালেন্তিঙকা, ‘রুশী এখানে কোথায়? এরা সব স্পেন দেশের লোক। আর এরা সব জংলী, গায়ের রঙ কালো, রোদে চকচক করে।’

‘তাই আবার হয়?’ হাই তুলে বললে গ্রুশা, ‘যতসব বানিয়ে বানিয়ে বলছে...’

‘তুই কী জানিস?’ চেঁচিয়ে উঠল তাইস্কা, ‘নিশ্চয় হয়!’

‘তাহলে তুই জানিস?’

‘হ্যাঁ, জানিই তো!’

‘দেখেছিস বুঝি? নাকি?’

‘হ্যাঁ, দেখেছিই তো!’

‘তোর সঙ্গে কথা বলাই আহাম্মুকি,’ বলে চুপ করে গেল গ্রুশা।

‘আরো কোনো ছবির গল্প জানিস তুই?’

‘জানি।’

‘কোনটা সম্পর্কে জানিস?’

‘সবকটা সম্পর্কে।’

‘বলবি? সব গল্পগুলো বলবি?’

ভালেন্তিঙকা কথা দিলে, বলবে। তবে আপাতত সে ছবিগুলো গুছিয়ে তুলে রাখল ব্যাগে। মা জাবনা তৈরি করছিল, এখন তার সঙ্গে গোয়ালে যেতে হয়।

'চল, আমিও তোর সঙ্গে বাছুর খাওয়াতে যাই,' প্রস্তাব দিলে তাইস্কা, 'দু'জনে একসঙ্গে খাওয়াব, এ্যাঁ?'

এতে খুশি হওয়া উচিত কিনা ভালেন্তিঙ্কা ভেবে পেল না। তাইস্কা যদি সত্যিই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, সে তো ভালোই। নাকি সে স্রেফ ন্যাকামি করছে, তারপর সুযোগ পেয়ে ল্যাঙ মারবে ভালেন্তিঙ্কাকে। প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় ভালেন্তিঙ্কা সায় দিলে:

'বেশ চল।'

গেল তিনজনেই। মা ছাড়া নাবালিকারা একলা কী ভাবে ব্যাপারটা সামলায়, সেটা দেখতে না গিয়ে মা পারল না। ভাগ্যি ভালো যে গিয়েছিল। তাইস্কা ঢুকেই ভেড়াগুলোকে এমন হকচকিয়ে দিলে যে আরেকটু হলেই তারা সবকটি বাচ্চাকে খুরের তলে দলে দিত। এঁড়েটার সঙ্গেও তার বনল না, রাগে জাবনা ভরা সমস্ত বালতিটাই তার মাথায় ঢেলে দেবার ইচ্ছে হল তার।

'নেঃ, ভাগ এখান থেকে!' মা বললে, 'এমন করে, মা, গরুর সেবা হয় না। যা বরং গিয়ে তাজা বিচালি নিয়ে আয়। সবুজ দেখে আনবি।'

'তাই ভালো!' বললে তাইস্কা, এবং ছুটে গেল বিচালি আনতে।

তাইস্কার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া।
তাইস্কার চোখে কালশিটে

বিকেলে আকাশ ফরসা হয়ে গেল, ফের একটু হালকা দাপট দেখা গেল শীতের। কিন্তু জমা বরফগুলো কালো হয়ে উঠেছে, চটায় ঢেকে গেছে। তল দিয়ে ঝিরঝিরিয়ে বইছে বরফ গলা জল। ভালেন্তিঙ্কাকে পেড়াপীড়ি করতে লাগল তাইস্কা:

'চল যাই মেয়েগুলোর কাছে! তুই একটা কী রে, কেবলি বাড়ি আর বাড়ি। কোণে বসে থাকিস একটা ইঁদুরের মতো।'

'যা, যা,' মা সায় দিলে, 'গায়ে একটু বাতাস লাগা।'

'খাদটায় যাব! মনে আছে, সেই যে মাটি আনতাম যেখান থেকে?'

সত্যি খাদটা দেখতে গেলে মন্দ হয় না। হয়ত এর মধ্যেই বরফ গলে গেছে ওখানে, গুহাগুলো দেখা যাবে?

ওভারকোট পরে নিলে ভালেন্তিঙ্কা। তার জীর্ণ জুতো জোড়ার বদলে মা ওকে দিলে গ্রুশার পুরনো মোটা ফেল্টবুট। ওরা দুজনে রওনা দিতেই রমানকও পেছন থেকে এসে সঙ্গ ধরলে। চারিদিকে দানা দানা বরফ ছড়ানো, পায়ের তলে তা ভাঙছিল মুড়মুড় করে। যেতে যেতেই ডাক দেওয়া হল ভার্যাকে, টোকা দেওয়া হল আলেঙ্কার জানলায়। এ মেয়েদুটি একটু দূরে দূরে রইল ভালেন্তিঙ্কার কাছ থেকে, এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি তারা।

গেল তারা গরু ভেড়া যাবার পথটা পর্যন্ত, তারপর একটা সরু হাঁটাপথ ধরলে, সেটা চলে

গেছে নিচের দিকে, নদীতে। এইখানে, হাঁটাপথটার কাছেই খাদটা। তার হলদেটে পাড় জবলজবল করছিল রোদে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ভার‍্যা:

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ, উইলোগাছ! কুঁড়ি ফুটেছে।'

'কোথায়?'

খাদের একেবারে প্রান্তে কতকগুলো ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি কচি উইলো ঝাড়। তার লালচে কালো ডালগুলোতে দেখা দিয়েছে রেশমের মতো চিকন শাদা শাদা কুঁড়ি। আশেপাশের মধ্যে এই গাছটাই সবচেয়ে সজীব, সবচেয়ে সুন্দর।

মেয়েগুলো ভাবতে বসল কী ভাবে ডালগুলো কেটে আনা যায়। খাদের নীচে গভীর বরফ... শুধু ভাবনার বালাই নেই তাইস্কার। সোজা বরফের স্তূপ ভেঙে এগুতে শুরু করলে সে। বাতাসে জমা বরফের চটায় কোথাও তার দেহের ভর সইছিল, কোথাও পা হড়কচ্ছিল, তখন হাঁটু পর্যন্ত তার পা দেবে যাচ্ছিল বরফের মধ্যে, আঁকুপাঁকু করে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছিল তাকে। আস্তিন আর ফেল্টবুট ভরে উঠল বরফে।

তাহলেও উইলো ঝাড়টায় পেঁছিল সে।

তার এ সাফল্য দেখে অন্য মেয়েগুলোও এগুল। ভালেন্তিঙ্কাও। ভয় করছিল তার — যদি মাথা পর্যন্ত ডুবে যায়, বরফে? আবার উত্তেজনাও হচ্ছিল — এই ধরনের তুষার স্তূপ উজিয়ে কখনো সে যায় নি। সে যেন এক নাবিক, যাত্রা করেছে এক অপার সমুদ্রে, জানে না পাড়ি দিয়ে পেঁছবে কিনা। বরফের চটায় যখন পা পিছলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন সে মাটি না ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে। যখন মুড়মুড় শব্দে ভেঙে পড়ছিল বরফ, তখন যেন সে কোন অতল গহবরে ঘুরে পড়ছে... হাতে পায়ে ভর দিয়ে সে উঠল, ঝেড়ে ফেললে তুষার, হেসে উঠল অন্য মেয়েদের সঙ্গে একত্রে।

সেও এসে গেল উইলো ঝোপটার কাছে। কী ফুঁয়ো-ফুঁয়ো, ডালগুলো কী টসটসে, ভাঙতে মায়া লাগে!

কিন্তু ভালেন্তিঙ্কার মায়া লাগলেও মায়া নেই তাইস্কার, এর মধ্যে পুরো এক গোছা ডাল ভেঙেছে সে। ভার‍্যা, আলেঙ্কারও মায়া নেই, লালচে কালো ডালগুলো তারাও ভাঙছে, কাটছে। মায়া নেই রমানকের — পায়ে হাঁটা শক্ত পথটুকুতে দাঁড়িয়ে থেকেই সে চিৎকার করছে তাইস্কা যেন তার ভাগেরটাও ভাঙে। কিন্তু শুধু হাতে তো ফেরা যায় না। সতেজ একটা ডাল ভাঙলে ভালেন্তিঙ্কা। কী রসালো, ভাঙতেই কী গাঢ় গন্ধ!

'এখনো শীত কাটে নি, অথচ কুঁড়ি ফুটছে,' ভাবলে ভালেন্তিঙ্কা। কিন্তু চারপাশে তাকাতেই নজরে পড়ল কালো কালো ন্যাড়া গাছগুলোর মধ্যে একটা ঝোপ, লালচে বাদামী আঁশ-আঁশ অঙ্কুর ফুটেছে তাতে। কী গাছ এটা? চারিদিকে ঝকঝক করছে বরফ, আর শোভায় ডগমগ করছে ঝোপটা, যেন মে মাস এসে গেছে। বরফের ওপর লালচে আঁশফুল! আরো দ্যাখো অবাক কান্ড: খাদের নিচে ছোট্ট একটা গাছে কচি পাতা ফুটেছে, যেন জড়িয়ে আছে হালকা সবুজ কুয়াসায়।

অথচ চারিদিকে তখনো ঘুমিয়ে আছে ফারগাছগুলো, একেবারে ন্যাড়া আর নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো মহীরুহ।

এ কোন যাদুর খেলা? নাকি বসন্ত নিজেই এই কুঞ্জবনে এসে ছুঁয়ে গেছে এই ঝোপগুলোকে?

'ভালেন্তিঙ্কা, তোর হল কী?' চ্যাঁচাল তাইস্কা, 'দাঁড়িয়ে আছিস যে?'

চমক ভাঙল ভালেন্তিঙ্কার। মেয়েগুলো এর মধ্যেই গিয়ে পেঁাছেছে হাঁটাপথটায়। বরফের স্তূপ উজিয়ে ফেরার পথ ধরলে ভালেন্তিঙ্কা। সবাই যখন একসঙ্গে হল, ভারি অবাক হল মেয়েগুলো:

'কী রে তুই, ভালেন্তিঙ্কা, গেলি, অথচ ডাল ভাঙলি না?'

'আমি অনেক ভেঙেছি, তুই নিবি?' বললে ভারয়া।

'আমি দিচ্ছি,' বাধা দিলে তাইস্কা, 'আমার অনেক আছে!'

হঠাৎ ঝোপগুলোর কোন পেছন থেকে ছুটে এল বরফের ঢেলা, গদাম করে পড়ল সোজা তাইস্কার পিঠে।

'উঃ, কে রে?'

শোনা গেল হালকা হাসি। ঝোপের পেছন থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল আরো খান কয়েক বরফের ঢেলা, কারো লাগল চাঁদিতে, কারো বুকে, কারো একেবারে কপালে...

'ছেলেগুলো রে!' চেঁচিয়ে উঠল ভারয়া, 'উইলো ডালগুলো কেড়ে নেবে! চল, পালাই!'

বাড়িমুখো ছুটল সবাই। সবার আগে ছুটল তাইস্কা, ভালেন্তিঙ্কা সবার পেছনে, ফেল্টবুট জোড়া তার খুবই প্রকাণ্ড আর ভারি। এমন কি রমানকও তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

'ধর, ধর ওদের!' পেছন থেকে চ্যাঁচালে ছোঁড়াগুলো, ছড়া কাটলে, 'উইলোর ছুড়ি, কাঁদিয়ে ছাড়ি, শাদা-শাদা উইলো, পিটিয়ে থুই লো! এ্যই!.. হে!'

ছোঁড়া বলতে মাত্র দু'জন, কিন্তু ভালেন্তিঙ্কার মনে হল পেছন থেকে ছুটে আসছে বুঝি এক আরণ্যক পঙ্গপাল।

বরফের ঢেলা উড়তে লাগল মাথার ওপর দিয়ে, মাঝে মাঝে দুম করে পড়ছে পিঠে। ভালেন্তিঙ্কা পেছিয়ে পড়ছে দেখে ওরা তাদের সমস্ত তুষার বৃষ্টি চালাল তার নীল হুডটা লক্ষ্য করেই।

মেয়েগুলো ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে, রমানকও লাফ মারছে খরগোসের মতো, শুধু ভালেন্তিঙ্কাই হোঁচট খাচ্ছে, পিছলে পড়ছে, পা ওর ছুটতে চাইছে না। কী করা যায়, বাঁচে কী করে?

তখন প্রাণপণে তীক্ষ্ম গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে:

'তাইস্কা, তাইস্কা!'

তাইস্কা ততক্ষণে ঢিপির ওপরে উঠে গেছে। থেমে তাকিয়ে দেখল সে। ছেলেদুটো ভালেন্তিঙ্কার পাল্লা ধরে ফেলেছে, মহোল্লাসে ছড়া কাটতে কাটতে দুদিক থেকে বরফ ছুঁড়ছে তার ওপর। আর দৌড়বার চেষ্টাও করছে না ভালেন্তিঙ্কা। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতে মুখ ঢেকে।

তাইস্কা তার উইলোর গোছা রমানকের হাতে দিয়ে ঠিক চিলের মতো ছোঁ মেরে ছুটে নামল নিচে। ছুটন্ত অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে আঁকড়ে ধরল আন্দ্রিউশকাকে, সেই ছিল কাছে। তার টুপি খসিয়ে ঝুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করল সে। আন্দ্রিউশকা তাকে ঘুঁসি মেরে টুপি কুড়িয়ে নেবার জন্যে নিচু হল। সেই সুযোগে তাইস্কা তার ঝাঁকড়া ঝুঁটি চেপে ধরল। কোল্যা সোশ্‌কিন নামে অন্য ছেলেটা প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, তারপর ফের ছুঁড়তে লাগল বরফের ঢ্যালা। শুরু হয়ে গেল মৃত্যুপণ লড়াই। আঁচড়াতে লাগল তাইস্কা, ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে গেল ক্ষিপ্ত মোরগের মতো। চ্যাঁচাল সে:

'পালা ভালেন্তিঙ্কা, পালা, আমি ওদের এক্ষুণি... দেখাচ্ছি!..'

ভালেন্তিঙ্কা কিন্তু পালাল না। হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে গেল আন্দ্রিউশকার দিকে, চাবকাতে শুরু করলে হাতের উইলো ডালটা দিয়ে।

'উহু মাগো!' চেঁচিয়ে উঠল আন্দ্রিউশকা, 'আরে, চোখে মারছিস যে!' বলে মুখ ঢাকল দুই হাতে।

ভালেন্তিঙ্কার হাত ধরল তাইস্কা:

'চল যাই! আর দরকার নেই। উইলোর ছড়ি কেমন কাঁদিয়ে ছাড়ে বাছাধনরা টের পেয়েছে!'

বাড়ি ফিরল তারা দিনের পাট শেষ হবার মুখে। লড়াইটার পর থেকে ভালেন্তিঙ্কা কেবলি কাঁপছিল। শান্ত হল সে কেবল ভেড়ার ছানাদের কাছে, হলুদ রঙা এঁড়েটার কাছে এসে।

তার নরম গলায় হাত বুলিয়ে সে বললে:

'ঈস, চাটতে তো পারিস খুব! আর ওদিকে খাদে যে কী কাণ্ড হল তার কিছুই জানিস না!'

কুঁড়ি সমেত উইলো ডালগুলো দিয়ে এক মস্তো তোড়া বানিয়ে রাখা হল বড়ো ঘরের টেবিলে। বনের একটা সূক্ষ্ম মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল কুটিরে। ভালেন্তিঙ্কা বসলে দাদুর কাছে:

'দাদু জানো, তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি নিজে দেখেছি।'

'কী দেখলি?'

'খাদের মধ্যে। চারিদিকে বরফ, অথচ ঝোপগুলোয় সবুজ পাতা। এইটুকুনি এইটুকুনি, কিন্তু সত্যি পাতা। আর আরেকটা ঝোপে, বড়ো ঝোপটায় লালচে লালচে আঁশফুল। যদি বিশ্বাস না হয়, চলো গিয়ে দেখবে!'

কিন্তু অবিশ্বাস করার কোনো লক্ষণই দেখালে না দাদু।

'দেখলি তো কেমন ব্যাপার!' হাসল সে, 'ওগুলো হল অলডার গাছ। ভারি তাড়া ওগুলোর। কেন জানিস, পাতাগুলো ফুটবার সময় যাতে কোনো বাধা না পায়। পাতা ফোটাতে চায় ফাঁকায়, বাতাসে যাতে কুঁড়িগুলো ফেঁপে ওঠে। আর ওই যে সবুজটা—ওটা হল ঔদিঅ্যার। ওর কোনো গুমর নেই। একটু রোদ পেলেই হল।'

সন্ধের খাওয়ার সময় সবার নজরে পড়ল যে তাইস্কার চোখ টকটক করছে লাল হয়ে, চোখের ওপরে কালসিটে। প্রথম চোখে পড়ল গ্রুশার:

'ঈস, তাইস্কার চোখটা দেখেছ?'

'একেবারে লণ্ঠন,' টিপ্পনি কাটলে দাদু, 'বাতির আর দরকার হবে না, ওতেই আলো হয়ে উঠেছে।'

'এ কী!' অবাক হল মা, 'কোত্থেকে ওটা জোটালি? ঠোক্কর খেয়েছিলি নাকি?'

'নিশ্চয় ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে মারামারি করেছে,' বললে গ্রুশা।

তাইস্কা নীরবে সুপ গিলছিল, যেন কথাগুলো ওকে নিয়ে নয়। কিন্তু শেষ মন্তব্যটায় ওর ধৈর্য টুটল। বললে: 'হ্যাঁ, করেছিই তো। আরো মারামারি করব!'

'ছি, তাইস্কা,' ভর্ৎসনা করে বললে মা, 'ছেলেগুলোর সঙ্গে মারপিট করা কি ভালো?'

'আর আমাদের ভালেন্তিঙ্কাকে যদি তারা মারে!' চেঁচিয়ে উঠল তাইস্কা, 'সেটা খুব ভালো না?'

'আমাদের ভালেন্তিঙ্কাকে ওরা বরফের ঢেলা ছুঁড়ে মেরেছে,' রাগত স্বরে বললে রমানক।

'আমাদের ভালেন্তিঙ্কাকে...' অস্ফুটস্বরে বললে গ্রুশা, যেন নিজেই কথাটা শুনছে কান পেতে, 'আমাদের...'

আর তাইস্কার কাঁধ চাপড়ে দিলে দাদু:

'ঠিক করেছিস! আমাদের কাউকে যদি মারে, ছাড়বি না। পিটিয়ে দিবি!'

বসন্ত উৎসব। ময়দার ভরত পাখি

এটা উৎসবই। কিন্তু এমন উৎসবের কথা ভালেন্তিঙ্কা কখনো কারো কাছে এমন কি গল্পও শোনে নি।

সন্ধে থেকেই তাইস্কা ঘুরঘুর করছিল মার কাছে:

'মা, দেখেছ, আজ কী তারিখ?'

'দেখেছি। বিশে। তাতে কী হল?'

'কী হল মানে? কাল যে একুশে। ভুলে গেছ?'

'একুশে তো কী হয়েছে? যুদ্ধ শেষ হচ্ছে নাকি?'

'না মা, অমন ভান করো না, কাল যে ভরত পাখিরা উড়ে আসবে।'

'নে, রেহাই দে তো আমায়,' বিরক্তিভরে বললে মা, 'বড়ো আমার দায় পড়েছে তোর ভরত পাখি নিয়ে! উড়ে আসবে, আসুক।'

প্রায় কেঁদে ফেললে তাইস্কা:

'বারে, ময়দা মাখতে হবে যে!'

কিন্তু কোনোই জবাব দিলে না মা।

তাহলেও বেশ রাত হতেই মা একটা মস্ত মাটির পাতিল নিয়ে কাউকে কিছু না বলে ময়দা মাখতে বসল।

পরের দিন আগেভাগেই উঠে ভালেন্তিঙ্কা বেরিয়ে এল অলিন্দে। হয়ত ভরত পাখির উড়ে আসা সে দেখতে পাবে?

তাজা জ্বলজ্বলে সকাল। জানলার নিচে চিরিকপিরিক করছে চড়ুইগুলো। কাক ডাকছে। দূরে একটা সুন্দর শাদা-কালো হাঁড়িচাঁচা বসে বসে কখনো এ চোখে কখনো ও চোখে দেখছিল ভালেন্তিঙ্কাকে। আর গোটা গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অবিরাম ডেকে উঠছিল কেবল মুরগীগুলো।

অলিন্দে এসে দাঁড়াল দাদু:

'এত সকাল সকাল উঠে এলি যে?'

'ভরত পাখি দেখব। তাইস্কা বলছিল, আজ তারা উড়ে আসবে।'

হাসল দাদু:

'বটে, খুব যে সখ! তা গত সপ্তাহে আমি একটার গান শুনেছিলাম বটে!'

একটা ঝাড়ু নিয়ে দাদু জলভরা নর্দমাটা পরিষ্কার করলে, তারপর বুড়ো বার্চগাছটার কাছে গিয়ে কী যেন শুনতে লাগল।

ভালেন্তিঙ্কা গেল তার কাছে:

'কী শুনছ দাদু?'

'শুনছি গাছটা কেমন রস টানছে। ওই শোন। শেকড় থেকে ওপর দিকে। কী টান দিচ্ছে। শুনছিস?'

গাছটার ঠাণ্ডা মসৃণ ছালে কান পাতলে ভালেন্তিঙ্কা। কোথায় যেন একটু মৃদু শনশন শব্দ শুনলে সে, একটু যেন ঝিরঝির। হয়ত ওটা নর্দমায় জল সরার শব্দ, হয়ত ডালগুলোর শনশন। তাহলেও ফিসফিসিয়ে সে বললে:

'শুনতে পাচ্ছি!'

হঠাৎ অলিন্দে এসে দাঁড়াল তাইস্কা, গাঁয়ের সমস্ত মোরগদের গলা ছাপিয়ে কাংস্যকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল:

'ভালেন্তিঙ্কা, চল ভরত পাখি বানাব, শীগগির! আঃ, শীগগির!'

ছুটে ভেতরে এল ভালেন্তিঙ্কা। রান্নাঘরের টেবিলে রয়েছে রাইময়দার ফেঁপে ওঠা তুলতুলে তাল। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে টেবিলটা। এমনকি আলসে গ্রুশাও আজ উঠেছে সকাল সকাল। রমানকও জেগে উঠেছে, যদিও প্রাতরাশ তখনো তৈরি হয় নি।

'ভরত পাখি গড়া হবে!' চেঁচিয়ে উঠল রমানক।

'ভরত পাখি মানে?' অবাক লাগল ভালেন্তিঙ্কার, 'কী দিয়ে গড়া হবে? ময়দা দিয়ে?'

'জানেন না উনি!' নিশ্বাস ফেলে বললে গ্রুশা, 'কিছুই জানেন না! মারিয়া মাসি ঠিকই বলেছিল...'

'নে হয়েছে, অনেক ঠিক কথা বলেছে তোর মারিয়া মাসি,' বাধা দিলে মা, 'লোকে যখন ভালো কথা বলে তখন সেটায় কান দিতে হয়। কিন্তু মন্দ কথা হলে সেটা শুনতেও হয় না, বলে বেড়াতেও হয় না। আর যেন কোনো মারিয়া মাসির কথা আমার কানে না আসে!'

'নে, ময়দা নে,' বললে তাইস্কা, 'পাখি বানা।'

'কী করে বানাব?'

'যেমন করে পারিস। ওই দ্যাখ, মা কেমন বানিয়েছে।'

মস্ত একটা ঝাঁঝরি প্যানে বসানো আছে প্রথম দফার ভরত পাখি। পাখির সঙ্গে অবশ্য সাদৃশ্য তার খুবই কম। লেজটা যেন ছোটো ছোটো বিস্কুটে গড়া, ডানার জায়গায় গোল গোল আঙটার মতো, চোখের বদলে শুকনো বৈঁচি ফল গোঁজা, আর ঠোঁট তো একেবারেই নেই। তাহলেও কে না জানে যে তা ভরত পাখিই।

মন দিয়ে পাখি গড়ছিল গ্রুশা। ঠিক মায়ের মতোই বানাতে চাইছিল সে। মা যখন অমনি ধারা বানিয়েছে, তখন সবারই তাই করা উচিত।

কিন্তু তাইস্কার পাখিটা হল অসাধারণ সুন্দর। লেজটা তার ছড়িয়ে আছে পাখার মতো। মাথার ওপর মুকুটের মতো উঁচু হয়ে আছে লম্বা ঝুঁটি, টেবিলের ওপর নেতিয়ে পড়া পাখায় একেকটি পালক ওপরে, একেকটি নিচে। এমন ভরত পাখি এমন কি স্বপ্নেও দেখা যায় না!

রমানকও কী একটা চটকাল, গোল পাকাল, বেলল, হাতে চাপড়ে চাপড়ে পাতলা করলে, তারপর আবার গোল পাকাল...

খানিকটা ময়দা নিলে ভালেন্তিঙকা:

'মানে, যেমন খুশি?'

তার পাখিটার লেজে দেখা গেল পাক খাওয়া তিনটে পালক, ডানা গজাল পিঠ থেকে, ঊর্ধ্বমুখী। চেহারাটা তার মায়ের পাখিগুলোর মতোও নয়, তাইস্কার মতোও নয়।

'বাঃ, বাঃ!' বললে তাইস্কা, 'আয়, এক কাজ করি। পাখিগুলো গড়া যাক সব একেবারে আলাদা আলাদা।'

ঝাঁঝরি প্যানটা ভরে উঠল। আশ্চর্য সব পাখি দেখা গেল সেখানে—কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো, কারো লেজ লম্বা, কারো খাটো, কারো মাথা ন্যাড়া, কারো বা ঝুঁটি... শুধু গ্রুশার পাখিগুলো হল সবই একরকম, বিস্কুট-বিস্কুট লেজ, আংটি-আংটি ডানা। রমানকও শেষ পর্যন্ত বানালে একটা। কিন্তু মা সেটাকে ঠাঁই দিলে না।

'কোথায় চাপাচ্ছিস ওই কেলেটাকে? কে এটা খাবে? ভরত পাখি না হাতি! ওর জায়গা হবে না!'

'না হয় না হল,' বললে রমানক, 'আমি ওটা এমনিই খেয়ে নেব,' এবং ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে নিজের পাখিটিকে গিলে ফেললে সে।

কেউ খেলতে গেল না, ঘুরঘুর করতে লাগল চুল্লির কাছে: কী জানি কেমন সেঁকে উঠছে পাখিগুলো, কী জানি কেমন রঙ ধরছে?

তপ্ত সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সারা কুঠিরে। ভরত পাখির গন্ধ—উৎসব আর বসন্তের গন্ধ... কিন্তু তৈরি হতে কত দেরি?

মাকে পেড়াপেড়ি করতে লাগল তাইস্কা:

'মা, এখনো হয় নি?'

'থাম তো!'

কিন্তু তাইস্কা আর থামে না:

'মা, আমি একটু দেখব... হয়েছে কিনা?'

'ভাগ এখান থেকে, চুল্লিতে হাত দিবি না!'

'বেশ, কিন্তু দেখো, খেয়াল রেখো...'

তৃপ্তিকর গন্ধটা হয়ে উঠল গাঢ় আর তপ্ত। চুল্লির ভেতর থেকে ঝাঁঝরি প্যানটা টেনে বার করলে মা।

ওহ্, কী আশ্চর্য, কী লালচে লালচে সব পাখি বসে আছে তাতে! পুরো এক ঝাঁক। এখন যদি ওরা তাদের অস্বাভাবিক ডানা নেড়ে উড়তে শুরু করে ঘরময়?

লাফাতে লাগল তাইস্কা, আনন্দে বিচিত্র সব শব্দ করতে লাগল। হেসে উঠল ভালেন্তিংকা। রমানক ছুটে গেল একেকটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিতে... শুধু গ্রুশা তাকিয়ে দেখতে লাগল দূর থেকে।

ওতে এত হৈচৈ করার কী আছে? ছোটোগুলোর কিছু একটা পেলেই হল!

প্রত্যেককেই একটি করে পাখি দিলে মা যার যেটি পছন্দ।

তারপর দাদু যখন সকালের খাওয়া খেতে এল, ছোটো তিনজন চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে:

'দ্যাখো দাদু দ্যাখো, ভরত পাখিগুলো উড়ে এসেছে!'

পাখিগুলো দেখে মাথা নাড়লে দাদু:

'হুঁ হুঁ, তা পাখির মতো পাখি!'

বরফ ফাটা। রমানকের প্রায় মাগেল্লানের দশা

মাঝ রাত্তিরে কী একটা দূরাগত অস্পষ্ট গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল ভালেন্তিংকার। সশংকে কান পাতল সে। আওয়াজটা কেমন যেন দরাজ, একটানা, একমুখী। উঠে পড়ল ভালেন্তিংকা। মাকে জাগিয়ে দেবে নাকি? হয়ত বা ফ্রন্টই এগিয়ে এসেছে? হয়ত রাস্তা দিয়ে চলছে জার্মান গাড়ি, আওয়াজ তুলছে, অথচ ঘুমিয়ে আছে গোটা গ্রাম, কিছুই শুনছে না?

জানলা দিয়ে দেখা যায় ঘুরঘুট্টি আঁধার রাত। সার্শিতে ঝরঝর করছে বৃষ্টি, আর কীসের যেন মৃদু টুকটুক শব্দ উঠছে বাইরের ফ্রেমে।

আওয়াজটা থামলও না, বাড়লও না। একটু নিশ্চিন্ত হল ভালেন্তিংকা। না, আওয়াজটা মোটরগাড়ির নয়। ঘন গাছের চুড়ো থেকে অমন আওয়াজ ওঠে ঝড়ের সময়। হয়ত সাগরের গর্জনও ওই রকম।

ফের শুলে ভালেন্তিংকা, কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল না। কী ঘটছে ওখানে, বসন্তের ওই ভেজা অন্ধকারে? কেমন যেন সেটা রহস্যময়, অপরূপ, খানিকটা বুঝি ছমছমে...

সকালে ঘুম ভেঙেও সেই একই একটানা শব্দটা কানে এল।

মুখ ধুচ্ছিল তাইস্কা। হেসে সে জল ছিটিয়ে দিলে ভালেন্তিংকার গায়ে।

‘ওঠ, নদী দেখতে যাব। বরফ ফেটে গেছে। শুনছিস কেমন ডাক ছাড়ছে?’

‘ওটা কি নদীর আওয়াজ? তার মানে এটা নদী! কাল রাতেই কানে এসেছিল। আর আমি ভাবছিলাম...’

‘কী ভাবছিলি?’

‘না, কিছু না।’

...নেচায়েভো গাঁয়ের সব ছেলেমেয়েই গিয়ে জুটল নদী পারে। ছোটোরা রইল রোদে তাতা উঁচু পাড়ে, বড়োরা আর সাহসীরা নেমে গেল একেবারে জলের কাছে। ওহ, কী কলকল করছে জল, কেমন পাক দিচ্ছে লাট্টুর মতো! খণ্ড-খণ্ড বরফ ভেসে যাচ্ছে জলে, ধাক্কাধাক্কি করছে, তীরে এসে লাগছে, ফের রওনা দিচ্ছে কোথায়। বেড়ে উঠছে নদীটা, ফেঁপে উঠছে, কূল ছাপিয়ে উথলে উঠতে শুরু করেছে। ভালেন্তিংকার মনে হল নদীটা ভারি বিশাল, প্রচণ্ড, ভয়াবহ। কে জানে হয়ত এখুনি আছড়ে পড়বে পারের ওপর, মাঠঘাট, গাছপালা ডুবিয়ে দেবে, ওদের সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বরফগুলোর সঙ্গে। কী গভীর নদীটা, কী তুহিন, ভয়ংকর সেই গভীরতা!

ছোটোরা ছিল পাড়ে, রমানকও ছিল তাদের সঙ্গে। একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে তারা ছোটো ছোটো লাঠি ছুঁড়ে মারছিল নদীতে, দেখছিল কীভাবে সেগুলো পাক খেয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণিতে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ছেলেগুলো। তীরের যে প্রান্তটাতে তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেটা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে যেতে শুরু করেছে। জিনিসটা ছিল আসলে তীরের লাগোয়া জমাট বরফ। একে একে সবাই লাফিয়ে নেমে পড়ল তীরে, শুধু ভ্যাবাচাকা খেয়ে একলা রমানক দাঁড়িয়েই রইল সেখানে, ভেবে পেল না কী করবে। ক্রমেই বাড়তে লাগল তীর আর তার মাঝখানের জলটা।

‘লাফা,’ চেঁচাল ছেলেগুলো, ‘চট করে লাফিয়ে পড়!’

‘লাফা না, হাঁদা কোথাকার!’ খেঁকিয়ে উঠল তাইস্কা।

ভাসমান বরফস্তূপটার ওপর বিহ্বল, করুণ, ছোট্ট রমানককে দেখে সবকিছু ভুলে গেল ভালেন্তিংকা। জলে ঝাঁপিয়ে সে রমানককে টেনে নিয়ে ফের উঠে এল তীরে।

ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল খুব ঝটিতি। ভয় পাবারও ফুরসত পায় নি ভালেন্তিংকা। কিন্তু এখন ভাসমান বরফটার দিকে তাকাল সে, স্রোতের টানে সেটা এখন ছুটছে—আর একটু আগেই কিনা তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল রমানক! কালো জলটার দিকে তাকাল সে, একটু আগেই যাতে সে ঝাঁপ দিয়েছিল—কী ছমছমে সে জল! আর এমন ভয় করে উঠল তার যে কান্না ঠেলে এল গলায়।

তাইস্কা ছুটে এসে চড় মারলে রমানককে, এমনভাবে তাকে নদী থেকে ভাগিয়ে দিলে যেন মানুষ নয়, ভেড়া তাড়াচ্ছে।

তারপর ভালেন্তিংকার কাছে এল সে:

‘এবার বাড়ি যাবি কেমন করে? ভিজে জবজব করছিস। ফেল্টবুট জোড়া নিশ্চয় জলে ভর্তি হয়ে গেছে। নে, খোল তো দেখি!’

মেয়েগুলোও ভালেন্তিংকার বুট খুলতে হাত লাগাল, উপুড় করে তার ভেতরকার জল ফেলে দিলে।

ঠাণ্ডায় কাঁপছিল ভালেন্তিংকা।

ভারা্যা বললে:

'চল যাই স্লাভিনা দিদিমার কাছে। ভালো লোক। শীতকালে আমরা যখন বরফের গর্ত ভেঙে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের সবাইকার জন্য সে অনেক করেছিল।'

'ঠিক বলেছিস,' কথা লুফে নিলে তাইস্কা, 'চল যাই!'

নিজের ছোট্ট কুটিরটায় স্লাভিনা দিদিমা থাকত একলা। আত্মীয় স্বজন তার কেউ ছিল না। কিন্তু পড়শীরা তার কাছে কিছু একটা চাইতে এলে, কিংবা বিপদে পড়ে ছেলেমেয়েগুলো তার কাছে ছুটে গেলে সে সর্বদাই যা পারত সাহায্য করত।

ভালেন্তিংকাকে ফেল্টবুট আর ভেজা পোষাকটা ছাড়তে বললে দিদিমা। নিজের ফারকোটটা তাকে পরতে দিয়ে আগুন জ্বালালে। তারপর টেবিলের ওপর এক কড়াই মিষ্টি-মিষ্টি সেদ্ধ বীট দিয়ে বললে:

'খা, বীট নয়, স্রেফ মধু।'

ঘটনাটার ঘোর মেয়েগুলো তখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ভালেন্তিংকাকে এড়িয়ে চলা তারা ছেড়ে দিয়েছিল। ভালেন্তিংকাও তাদের আর ভয় করত না। তার নীল হুড নিয়ে হাসাহাসি আর করত না তারা, উঁকি দিয়ে দেখত না তার মোজা জোড়া কী রকম।

'যাই বলো আমাদের ভালেন্তিংকার কিন্তু সাহস আছে,' বললে তাইস্কা, 'আমার তখনো পর্যন্ত টনকই নড়ে নি...'

আলেংকা খানিকটা সময় নিয়ে বললে:

'সোজা একেবারে জলে! বাবা রে!.. আর যদি ওখানটায় গর্ত থাকত?'

'ভয়ংকর ব্যাপার!' ফিসফিস করলে ভারা্যা।

'ভয়ংকর হল তো কী হয়েছে?' বললে ভালেন্তিংকা, 'রমানক যদি তোর ভাই হত? তাহলে তুইও ঝাঁপ দিতি। হোক না ভয়ংকর! অবিশ্যি...'

হঠাৎ কেঁদে ফেলল সে। ফের সেই ছবিটা ভেসে উঠেছিল তার মনে: উত্তাল নদীতে ভেসে যাচ্ছে বরফের স্তূপটা, আর রমানক তার ওপর দাঁড়িয়ে ভীত-ত্রস্ত নীল চোখ মেলে চেয়ে দেখছে সবার দিকে। তারপর টাল খাচ্ছে বরফটা, পাক খাচ্ছে জলে। মাগো! সত্যিই যদি তা ঘটত?

'কিন্তু সত্যিই তো আর ঘটে নি!' বার বার করে বলতে লাগল তাইস্কা, 'সত্যিই তো আর ঘটে নি!'

তারপর নিজেই সে ফুঁপিয়ে উঠল হঠাৎ। এবং সঙ্গে সঙ্গেই রেগে উঠল:

'রমানকটাকে আমি আচ্ছা করে দেব আজ। নদীতে নাক গলাতে আসার মানেটা টের পাইয়ে ছাড়ব!'

'আগুনে'র সূর্য দর্শন

দিনগুলো ছিল ছাই রঙা। মাটির ওপর ভেসে ছিল গাঢ় ধূসর কুয়াশা। রাতে কিছুই দেখা যেত না। শুধু শনশন করত বাতাস, আর দূরে খলখল করত নদী।

হঠাৎ ঝলক দিল সূর্য। ঝকঝক করে উঠল উলের বলে গোঁজা গ্রুশার বোনার কাঁটাগুলো, রুপোর মতো চকচক করে উঠল দেরাজের হাতলগুলো, ঝকমকিয়ে উঠল শেলফে রাখা বাসনপত্র, আর মাটির বড়ো পাতিলটায় পরিষ্কার ফুটে উঠল নীল ফুলের নকসা।

ওদিকে জানলার তাকে রোদের তাপ পেয়ে সতেজ আর সবুজ হয়ে উঠল দাদুর বোনা শস্যগুলো।

ভালেন্তিংকা ছিল চুপচাপ স্বভাবের। কিন্তু ওর মনে হল যেন কী একটা দুর্বোধ্য একটানা উৎসব শুরু হয়েছে। সে উৎসবের কোনো নাম নেই, তাহলেও হাওয়ায় তা ভাসছে, জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে। বাইরে গেল সে, সেখানেও তা আছে। আর আছে একেবারে চুটিয়ে! অদৃশ্য হয়েছে বরফ, কুয়াশা আর কালো কালো রাতগুলো হটিয়ে দিয়েছে তাদের। আর এখন জায়গায় জায়গায় বরফ গলা জল জমে আছে নীল হয়ে, ঠিক যেন আয়নার টুকরো, রোদ পড়লে তা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আঙিনায় ঝিরঝিরিয়ে বইছে একটু জলস্রোত। আর বাড়ির কাছে বুড়ো বার্চগাছটায় ডাকছে হরবোলা পাখি। ডাকছে কী! যেন নিজেই সে তার সুরেলা গলাকাঁপুনিতে ঝরে পড়তে চাইছে, অফুরান পুলকের শিহরণে মেলে দিয়েছে দুই ডানা।

বেড়া ঠিক করছিল দাদু। কুড়ুলের উল্টোপিঠ দিয়ে সে বাড়ি মারল সরু সরু খোঁটাগুলোর মাথায়, বড়ো খুঁটিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে তাদের নরম উইলো ছাল দিয়ে বাঁধলে।

কিন্তু হঠাৎ কেন জানি থেমে গেল দাদু, দাড়ি উঁচু করে কী যেন দেখতে লাগল আকাশে। সঙ্গে সঙ্গেই সচকিত হয়ে উঠল ভালেন্তিংকা। কী ব্যাপার? এরোপ্লেন নাকি? জার্মান?

আঙুলের ইশারা করে দাদু তাকে ডাকলে। আর গিয়ে শুনল ভালেন্তিংকা—কী আনন্দ! জার্মান প্রপেলারের কর্কশ, জঙ্গী আওয়াজের বদলে কেবল পাখির গান। যেন রুপোর ঘণ্টা বাজছে অনেক উঁচুতে। যেন রুপোর বৃষ্টি ঝরছে মাটিতে। আকাশের অনেক উঁচুতে কাঁপছে ছোট্ট একটা পাখি।

'কী পাখি এটা দাদু?' জিজ্ঞেস করলে ভালেন্তিংকা, 'নাইটিঙ্গেল?'

'না রে, নাইটিঙ্গেল নয়,' বললে দাদু, 'এটা হল আমাদের চাষীর পাখি। ও হল চাষীর সঙ্গী। চাষী খাটে মাঠে, আর ওটা গান গায় ওপরে, চাষীকে আনন্দ দেয়। এই হল, ভালেন্তিংকা, ভরত পাখি।'

'ভরত পাখি?!'

সঙ্গে সঙ্গেই ময়দা দিয়ে তারা যে ভরত পাখি বানিয়েছিল, সে কথা মনে পড়ে গেল ভালেন্তিংকার। কী রকম সে দেখতে? তাইস্কা যা বানিয়েছিল তেমনি চওড়া ডানা, মাথায় ঝুঁটি? নাকি সে যা গড়েছিল সেই রকম—লেজে তিনটে পালক? কী ওটার রঙ—নীল নাকি লালচে?

না, না, মোটা বইটায় ভরত পাখির ছবি দেখেছে সে। ছোট্ট পাখি, মাথায় একটু ঝুঁটি। ঠিক চড়ুইয়ের মতোই ছেয়ে রঙের সাধারণ পাখি।

নয় চড়ুইয়ের মতোই হল! নয় খুবই সাধারণ, খুবই ছেয়ে রঙেরই হোক! তাহলেও এটা দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা পাখি!

জ্বলজ্বলে সবুজের ঝিলিক দেওয়া রাস্তার মাঝখানে একের পর এক জুটতে লাগল যৌথখামারী মেয়েরা। প্রথমে দেখা হল দু'জনের, কী কথাবার্তা বলে ওখানেই তারা দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আশেপাশের বাড়ি থেকেও আরো মেয়ে এসে যোগ দিলে। তপ্ত আকাশটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল সবাই। দেখলে বরফ গলে যাওয়া, জায়গায় জায়গায় জল জমা গোচারণ মাঠটার দিকে, আর কী নিয়ে যেন আলাপ করতে লাগল...

'তা সময় হয়েছে বলেই মনে হয়... ওই দ্যাখো না, বিছুটি গাছও গজিয়েছে।'

'তাই বটে... বসে বসে কী করবে, চরে বেড়াক। ভান্যা, ছুটে গিয়ে রাখালকে ডেকে আন তো!'

বেড়ার দরজা খুলে বেরিয়ে এল মা।

'কী গো, গরু ভেড়া চরতে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ গো, সেই কথাই ভাবছি।'

'ভাববার কী আছে? দিব্যি গরম পড়েছে... আরে ওই তো যৌথখামারের সভাপতি যাচ্ছে... ওগো ভাসিলি নিকিতিচ, একটু এসো না আমাদের কাছে, পরামর্শ আছে!'

যৌথখামারের সভাপতি শক্তসমর্থ, অভিজ্ঞ বুড়ো, মেয়েদের কাছে এসে টুপি খুলে মাথা নোয়ালে:

'তা পরামর্শটা কী নিয়ে?'

'গরু ভেড়া নিয়ে। চরে বেড়ানোর সময় হয়েছে, তাই না?'

'বেশ তো,' জবাব দিলে ভাসিলি নিকিতিচ, 'চরানো শুরু করা যাক।'

তারপর দারিয়া মাসির দিকে ফিরে সৌজন্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে:

'তা দারিয়া, কেমন আছে তোর নতুন মেয়ে? মন বসছে?'

'বসছে,' জবাব দিলে মা।

'খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা! মেয়েটাকে মানুষ কর দারিয়া, কিছু দরকার পড়লে আমার কাছে আসিস। যৌথখামার তোকে সাহায্য করবে।'

বার কয়েক তার উদ্দেশে মাথা নোয়ালে মা:

'ধন্যবাদ গো ভাসিলি নিকিতিচ, তোমার ভালো মনের কথাগুলোর জন্যে ধন্যবাদ!'

গরু চরতে যাবে ঠিক করে মেয়েরা যে যার বাড়ি চলে গেল।

তাইস্কা লাফিয়ে এল রাস্তায়।

'ভালেন্তিঙ্কা, চল দেখতে যাই।'

রাখাল দাঁড়িয়েছিল গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। চাবুক হাঁকিয়ে সে সপাং সপাং শব্দ করলে, যেন গুলির শব্দ। এটা সে করলে বার কয়েক...

সারা গ্রাম জুড়ে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে ফটক খুলতে লাগল—হেমন্তে দীর্ঘকালের জন্যে ফটক বন্ধ হবার পর খুলল এই প্রথম। সারা গ্রাম জুড়ে উঠল গরুর হাম্বা, ভেড়ার ভ্যাঁ-ভ্যাঁ... হুলস্থুল লাগল রাস্তায়।

সবার আগে মা খুলে দিলে মিলকা গরুটিকে। মাথা তুললে মিলকা, নাক ফুলিয়ে ডাক ছাড়লে যেন শিঙা ফুঁকছে। ঘুম-ঘুম চোখদুটো ওর চকচক করে উঠল, যেন মশাল জ্বলে উঠেছে ওর বড়ো বড়ো কালো মণির পেছনে।

'নে যা, যা!' মা বললে তাকে উইলো ঝাড় দিয়ে সামান্য বাড়ি মেরে (তাই প্রথা, প্রথম দিন গরু তাড়াতে হয় উইলো ডাল দিয়ে), 'যা এখন, অন্যগুলোকে পথ ছাড়!'

ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এল মিলকা এবং ফের শিঙা বাজালে। আশেপাশের গরুগুলোও সাড়া দিলে তার ডাকে।

ভেড়াশালের দরজা খুললে মা, ভীড় করে বেরিয়ে এল সবাই। ভেড়া-মায়ের গা ঘেঁসে রইল বাচ্চাগুলো। ডাকাডাকি লাগাল। মাও ডাক ছেড়ে জবাব দিলে তাদের। শাদাবুকটা ভালেন্তিঙকাকে দেখে তার কাছে ছুটে যেতে চাইছিল, কিন্তু বাকি ভেড়াগুলো অন্যদিকে পা বাড়াতে সেও লেজ চেপে তাদের পেছন পেছন ছুটল।

আগুনেকে বিদায় দেওয়াটাই হল সবচেয়ে কঠিন। ভারি খুশি হয়ে উঠল সে রোদ্দুরে, খোলা বাতাসে, যে অসীম উন্মুক্তি খুলে গেল তার সামনে, তাতে। ধেয়ে গেল সে, গুঁতো মারল, লাফাল, এমন ছুটোছুটি লাগাল যে মনে হল যে এই বুঝি বেড়ায় বা দেয়ালে ধাক্কা খায়। মা তাকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলে। ভালেন্তিঙকাও বোঝাতে লাগল:

'আস্তে, একেবারে হাঁদাটা, একটু সামলে! তুই কী রে, ক্ষেপে গেলি নাকি?'

শেষ পর্যন্ত মা আর ভালেন্তিঙকা দুজনে মিলে এঁড়েটাকে বার করে আনলে রাস্তায়। রাস্তায় সে বার দুই চেটে দিলে ভালেন্তিঙকাকে, মার অ্যাপ্রনটাও চেখে দেখার সুযোগ ছাড়লে না। কিন্তু বাইরে এতটা ফাঁকা দেখে সে ফের দুরন্ত হয়ে উঠল, ডাক ছেড়ে, লেজ তুলে, ছোটাছুটি করে সে গিয়ে পড়ল একেবারে পুকুরের মধ্যে। ঠান্ডা জলে একটু চৈতন্য ফিরল তার। পুকুর থেকে খলবলিয়ে উঠে মাথা ঝাঁকাতে লাগল সে। কিন্তু অন্য বাছুরগুলোকে দেখে আবার ছুট লাগাল সঙ্গে সঙ্গেই।

'ক্ষ্যাপা একেবারে!' বিচলিত হয়ে বলতে লাগল ভালেন্তিঙকা, 'দ্যাখো না, শাদা শাদা পাগুলো সব একেবারে নোংরা করে বসেছে!'

গরু ভেড়াগুলো এগুতে লাগল ধীরে ধীরে। গিন্নিরা চলল তাদের নিজেদের গরু ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে। থেমে যাচ্ছিল গরুগুলো, গুঁতোগুঁতি করতে চাইছিল—তাদের সামলাতে হচ্ছিল। ভেড়াগুলো দল বেঁধে একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে। তাদের চালাতে হচ্ছিল সোজা রাস্তা দিয়ে।

যৌথখামারের খোঁয়াড়ের দুয়ার খুলল। ইয়ারোস্লাভলী উঁচু জাতের শাদাকালো বাছুরগুলো একের পর এক বেরিয়ে এল খোঁয়াড় থেকে।

তাইস্কা ঝাঁকুনি দিলে ভালেন্তিঙ্কাকে:

'চল, কাছে গিয়ে দেখি।'

'ঢিঁসবে না তো?'

'আরে না, আমরা পেছন থেকে দেখব।'

দু'জনে ওরা চলে গেল রাস্তার মাঝখানে, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল পালটার কাছে। বন থেকে আসা টাটকা বাতাস ঝাপট মারছিল তাদের মুখে। মাঠগুলোয় আনন্দ-ভরা গভীর স্তব্ধতা। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোদে আঁচড়ানো বন। সে বন যেন হঠাৎ চুপ করে গেছে, কান পেতে কী একটা যেন শুনছে। কী ব্যাপার সেখানে? কী কান্ড ঘটছে তার রহস্যময় গভীরে?

হঠাৎ একেবারে পেছন থেকে ভেসে এল একটা অনুচ্চ কিন্তু একটানা ভয়াবহ গর্জন।

'ষাঁড়!' চেঁচিয়ে তাইস্কা ছুটল বাড়ির দিকে।

তাকিয়ে দেখল ভালেন্তিঙ্কা। খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে আসছে মস্তো এক হালকা-লালচে ষাঁড়। ঢিপকপালী মাথাটা নুইয়ে সে এগিয়ে আসছে আর ডাক ছাড়ছে। দুপাশে উঁচু হয়ে আছে তার ছুঁচলো শিঙ। কয়েক পা এগিয়ে সে শিঙ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ভালেন্তিঙ্কা, এক পা-ও সে নড়তে পারল না, চোখ সরাতে পারল না ষাঁড়টার কাছ থেকে।

'পালা, ছুটে পালা!' চেঁচিয়ে বললে তাকে তাইস্কা।

ভালেন্তিঙ্কা চেয়ে দেখল, দিগ্বিদিকে ছুটে পালাচ্ছে ছেলেমেয়েগুলো, রমানকও ত্রস্ত রাজহাঁসের মতো পড়শীদের অলিন্দের দিকে ছুটছে।

তখন চৈতন্য হল ভালেন্তিঙ্কার। ছুট লাগাল সে, আর ষাঁড়টাও যেন তারই অপেক্ষায় ছিল। সেও শিঙ বাগিয়ে ছুটল তার পেছন পেছন।

পাঁচ কদম এগিয়ে থেমে গিয়েছিল ষাঁড়টা, ভালেন্তিঙ্কা কিন্তু আতঙ্কে ছুটেই চলছিল। সে দেখেছিল ষাঁড়টা তাড়া করেছে তাকে, ঠিক পেছনেই শুনেছিল তার ভাঙা-ভাঙা গর্জন, টের পাচ্ছিল তার প্রকান্ড দুটো শিঙ... আর চেঁচিয়ে উঠল ভালেন্তিঙ্কা, ডেকে উঠল মরীয়ার মতো:

'মা! মা!'

জানত না সে কোন মাকে তখন ডাকছে। হয়ত যে বেঁচে নেই তাকেই। কিন্তু গরুটার পেছন থেকে ছুটে এল হালকা কটা চুলের রোগা একটি নারী, হাত বাড়িয়ে তাকে বললে:

'এই তো রে মেয়ে, আমি এখানে, চলে আয়, ভয় নেই!'

ভালেন্তিঙ্কা লাফিয়ে তার ঘাড় ধরে সজোরে জড়িয়ে ধরলে তাকে। বিপদ আর তার নেই। ষাঁড়টা যত ভয়ঙ্করই হোক, মার কাছে কি আর সে ঘেঁষতে সাহস পাবে?

'আসুক না দেখি,' বলল মা, 'এ লাঠিটা তাহলে কিসের জন্যে?'

গরু ভেড়ার পাল চলে গেল গাঁ ছাড়িয়ে। সব চেয়ে শেষে গেল ষাঁড়টা। কেবলি ডাক ছাড়ছিল সে, মাটি শুঁকছিল, মাথা ঘোরাচ্ছিল—বোঝাই যায়, বসন্তের চড়া গন্ধে চকে গিয়েছিল সে।

মার নীল নীল চোখে দেখা দিল গর্বের আনন্দ। শেষ পর্যন্ত তাহলে 'মা' বলে ডাকল তাকে! মারিয়া মাসি কি উস্তিনিয়া বুড়ীর কি আজ কানে যায় নি কী ভাবে ওই পরের মেয়ে কালোচুলো ভালেন্তিংকা আজ গোটা রাস্তা ফাটিয়ে তাকে ডেকেছে, 'মা, মা!'

ভালেন্তিংকা জানত মার এত আনন্দ কেন। কিন্তু ওকেই কি সে মা বলে ডেকেছিল? হয়ত নয়?

হয়ত নয়। তাহলেও সবচেয়ে কঠিন কথাটি সে বলে ফেলেছে। আর একবার যখন বলা গেছে, তখন তার পুনরাবৃত্তি করা তো অনেক সহজ।

ফ্রণ্টের চিঠি

ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল ফ্রণ্ট। কঠিন লড়াইয়ে লাল ফৌজ শত্রুদের হটিয়ে দিচ্ছিল স্বদেশভূমি থেকে। আগের মতোই যৌথখামারের লোকে প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকত ডাক-পিয়নের জন্য। ফৌজ থেকে চিঠি আসে নি? খবরের কাগজে কী বলছে: জার্মানরা হটেছে, নাকি ফের চেপে আসছে?

প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে যেত মা। ফ্রণ্ট থেকে চিঠি আসছে না তো আসছেই না। ডাক-পিয়নের জন্যে নিজে সে গিয়ে দাঁড়াত ফটকে। কিন্তু দূর থেকেই দেখা যেত, ডাক-পিয়ন হেঁটে যাচ্ছে গ্রাম দিয়ে, কিন্তু তাদের বাড়ির দিকে ফেরার নামও করছে না। মাথা নিচু করে আবার আস্তে আস্তে ঘরে ফিরত সে।

কেমন নীরব একটা দুঃখ অলক্ষ্যে বাসা বাঁধল সংসারটায়। কেউ সে কথা বলত না, কিন্তু টের পেত সেটা, জানত। টের পেত না শুধু রমানক। তার অটুট বিশ্বাস ছিল যে দুনিয়ায় সবকিছুই খুব ভালো, মন্দ বলে আদৌ কিছু নেই।

তারপর একদিন দাদু খেতে এল কেমন একটা অস্বাভাবিক মেজাজে। প্রথমত বেশ ফুর্তির সঙ্গে সে হুম-হাম গুঁক-গাঁক করলে। দ্বিতীয়ত, সেদিন তাকে ভারি কথায় পেয়ে বসেছিল।

'তা কেমন আছিস রে তোরা, বিচ্ছুগুলো। কী খবর গো বৌমা, কী রাঁধলে আজ? ব্যাঙের ছাতার সুপ। খাশা, এই তো চাই!'

তারপর খেতে বসে এমন কি গানের মতোই কী একটা গুনগুন করলে।

মা হেসে তাকাল তার দিকে:

'তোমার আজ কী হয়েছে বাবা? রাষ্ট্রীয় লটারিতে কিছু একটা পেয়েছ?'

হুঁ-হুঁ করে হাসল দাদু:

'লটারি? ভারি তোর লটারি! লটারি ফটারি নয়, আরো বেশি কিছু...'

'তা বেশিটা কী? মেডেল টেডেল পেলে নাকি?'

'মেডেল হোক না হোক, পেয়েছি কিছু একটা!'

তারপর আর পারল না, পকেট থেকে বার করল নীল একটা খাম।

'এই দ্যাখো কী পেয়েছি!'

'চিঠি!' চেঁচিয়ে উঠল মা।

'চিঠি এসেছে!' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেমেয়েগুলো।

গ্রুশা সবে ঢুকেছিল ঘরে, চিঠি দেখেই সে তাড়াতাড়ি তার স্কুলের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে ছুটে এল।

চুল্লি থেকে সুপ নামাতে যাচ্ছিল মা, কিন্তু সেসব ভুলে সে তার সাঁড়াশি নামিয়ে রাখলে।

'তুমি যে কী বাবা! পড়ে শোনাও না তাড়াতাড়ি!'

সন্তর্পণে লেফাফা থেকে চিঠিটি বার করলে দাদু, চশমা পরলে। ছেলেমেয়েগুলো সবাই ঘিরে ধরলে তাকে। শুধু ভালেন্তিঙ্কা যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রন্টের চিঠিটা পড়ে শোনাল দাদু। বাবা লিখেছে যে সে বেঁচে আছে। ভালোই আছে। ভারি কামান দিয়ে লড়ছে ফাশিস্টদের সঙ্গে। কিন্তু ফাশিস্টগুলো ছুঁচোর মতো বাড়ির তলে আর গহ্বরে গিয়ে ঢুকেছে, সেখান থেকে শালাদের বার করা সহজ নয়।

বড়ো রকমের একটা যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছে বাবা, লিখেছে কী ভাবে তারা কয়েকটা জনপদ থেকে শত্রুদের হটিয়েছে।

তারপর জিজ্ঞেস করেছে সংসারের অবস্থা কী, ছেলেমেয়েগুলো ভালো আছে তো, গ্রুশা পড়াশুনা করছে কেমন...

গ্রুশা সগর্বে মাথা তুলে তাইস্কা আর রমানকের দিকে চাইল: দ্যাখো, বাবা তার কথা জিজ্ঞেস করেছে আলাদাভাবে!

'তাইস্কা কেমন আছে, খুব দুরন্তপনা করছে তো?'

তাইস্কা একেবারে লাফিয়ে উঠল। ওর কথাও জিজ্ঞেস করেছে আলাদা!

'কেমন আছে আমাদের রমানক, আমাদের ভবিষ্যৎ লড়িয়ে? বড়োসড়ো হয়ে উঠছে তো, নাকি এখনো তেমনি পুঁচকে, টেবলের তলে গিয়ে সেঁধয়?'

'আমার কথাও লিখেছে,' চেঁচিয়ে উঠল রমানক, 'আমার কথাও!'

মা এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল দাদুর দিকে. মনে হল যেন আরো কী একটা জরুরী কথা শুনতে চাইছে সে, খুবই জরুরী...

'দারিয়া, আদরের বৌটি আমার,' দাদু পড়ে গেল, 'তুমি লিখেছিলে যে অনাথা ভালেন্তিঙ্কাকে তুমি সংসারে নিয়েছ...'

এই বার! সবাই চেয়ে দেখল ভালেন্তিঙ্কার দিকে। সচকিত হয়ে উঠল ভালেন্তিঙ্কা, আর লাল হয়ে উঠল মায়ের গাল।

দাদু পড়ে গেল:

'বলতেই হবে যে দারিয়া, ভারি বুদ্ধিমতী, ভারি ভালো লোক তুমি। কিছু লোক কী বলছে তাতে কান দিও না। অনাথা মেয়েটি যেন আমাদের ঘরেই তার ঘর পায়, আমাদের সংসারেই

সংসার পায়। ছেলেমেয়েগুলোকে বলে দিও যেন ওকে কোনো দুঃখু না দেয়। সুখে স্বচ্ছন্দে মেয়েটি বেড়ে ওঠুক।'

এতক্ষণ পরে নিঃশ্বাস নিলে মা। ফিসফিসিয়ে বললে:

'যাক বাঁচা গেল!'

আর রমানক ভালেন্তিঙ্কার কাছে ছুটে গিয়ে উল্লাসে তার ফ্রক ধরে টানতে লাগল:

'শুনলি? তোর কথাও লিখেছে!'

'শুনলাম,' বললে ভালেন্তিঙ্কা, এবং একটু লাল হয়ে ঠিক গ্রুশা আর তাইস্কার মতোই সগর্বে তাকিয়ে দেখল সবার দিকে।

আর আচমকা বলে উঠল গ্রুশা:

'মা, ভালেন্তিঙ্কার জন্যেও এক জোড়া মোজা বুনতে হয়, তাই না?'

তুষার ফুল

আর ক্রমেই তার সম্ভার আর রূপের ডালি খুলে বসছিল বসন্ত। হঠাৎ কুঁচি দেখা দিল বুড়ো বার্চগাছটায়। সকাল হতেই সেটা চোখে পড়েছিল ভালেন্তিঙ্কার। সারা গাছটা ছেয়ে গেছে কালচে লাল কোরকে, ধূসরিত হয়ে উঠেছে সোনা-সোনা রেণুতে।

আর গোপনে গোপনে, ধরা ছোঁয়া না দিয়ে কখন যেন গাঢ় হয়ে উঠল বনের রঙ। নিচের দিকটা তার তখনই সবুজ হয়ে উঠেছে ঘাসে, ঝোপঝাড়ে। অজানা ওই বনের রাজ্যে যদি একবার উঁকি দেওয়া যেত! কিন্তু তা কি সম্ভব?

ঠিক এই সময়েই কাঠ কাটার দরকার পড়ল দাদুর। কুড়ুল নিয়ে সে বললে:

'কী রে মেয়েরা, বনে ব্যাঙের ছাতা তোলার শখ আছে কার?'

রমানক ছুটল ঝুড়ি আনতে। তাইস্কা চটপট তার জুতো খুলে ফেলে খালি পায়ে ছপছপ করতে লাগল জলের মধ্যে।

'চল যাই। দাদু জানে কোথায় ব্যাঙের ছাতা গজায়, দেখিয়ে দেবে।'

'দাদু, আমিও যাব?' জিজ্ঞেস করলে ভালেন্তিঙ্কা, 'আমার যাওয়া চলবে?'

'কেন চলবে না?' বললে দাদু।

'আমিও খালি পায়ে?'

'সে তোর ইচ্ছে। যদি কাঁটা ফোটার ভয় না থাকে, তবে খালি পায়েই চল।'

'তাহলে একটু দাঁড়াও, চলে যেও না! এক্ষুণি আসছি!'

ছুটে ঘরে ঢুকল ভালেন্তিঙ্কা। ঘরে কেউ নেই। গ্রুশা গেছে ইশকুলে, মা কাজে। তাড়াতাড়ি সে তার জীর্ণ জুতো জোড়া খুলে গুঁজে রাখল পৈঠার নিচে। তাড়াতাড়ি ছুটে যাবার সময় আচমকা তার হাত লেগে পড়ে গেল তার হলদে ব্যাগের বেল্ট, সেটা ছিল তার বিছানায় বালিশের ওপর। পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ল তার সাধের ছবিগুলো: বরফ ঢাকা কুটির, মরুভূমিতে ক্যারাভান,

অজানার পথে মাগেল্লানের জাহাজ... তাড়াতাড়ি করে সে যেমন পারল এলোমেলো ব্যাগে ভরল। যেখানে খুশি ভেসে যাক না মাগেল্লান! আজ ভালেন্তিংকা যাচ্ছে বনে, সত্যিকারের জঙ্গলে! খালি পায়ে সে ছুটে যাবে জমা জল আর তাজা ঘাসের ওপর দিয়ে, চলে যাবে মাঠ উজিয়ে আর সত্যিই হয়ত সে খুঁজে পাবে সত্যিকারের জীবন্ত ব্যাঙের ছাতা! যেখানে ইচ্ছে চলে যাক গে মাগেল্লান! হাঁটা পথটা চলে গেছে ক্ষেত দিয়ে। জমি চাষ করছে যৌথখামারী কৃষাণীরা। বইয়ে হাল চাষের ছবি দেখেছিল ভালেন্তিংকা, কিন্তু সে ছবিতে দেখা যেত কেবল পুরুষদের... তা কী আর করা যাবে। যুদ্ধ চলছে যে। পুরুষেরা গেছে লড়তে, লাঙল ধরেছে মেয়েরা।

আর লালচে বাদামী ঘোড়াটা দিয়ে কে লাঙল দিচ্ছে ওখানে? কে ওই মেয়েটি, দেখতে রোগা, কিন্তু কাজ করছে কী নিপুণ, কী পরিপাটি? অবিরাম জু-জু-জু করে তাড়া দিচ্ছে না সে, অকারণে ধমকাচ্ছে না ঘোড়াটাকে। কিন্তু ঘোড়া তার চলছে সমান তালে, আর যে লাঙল ধরে আছে মেয়েটি মোটেই তা এঁকেবেঁকে যাচ্ছে না, চলছে সোজাসুজি গভীর গর্ত তুলে। কে ওই মেয়েটি, অমন চেনা-চেনা নীল জামা, কাঁধের কাছটায় রঙ উঠে যাওয়া?

হঠাৎ চিনতে পারল ভালেন্তিংকা:

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ, আমাদের মা লাঙল দিচ্ছে!'

বন তাদের বরণ করলে ঠান্ডা নরম আর্দ্র গন্ধে, পাখিদের উচ্ছল কলকাকলীতে। গাছগুলো তখনো ন্যাড়া, কিন্তু ঝোপঝাড়গুলোয় পাতা ফোটার কুঁড়ি বেরিয়েছে। আর নিচে, গতবছরের কালচে হয়ে আসা ঝরা পাতাগুলো ফুঁড়ে সর্বত্র মাথা তুলেছে অজস্র ফুল: কালো কালো মখমলী পাতাগুলোর মধ্যে লালচে, বেগুনী, গোলাপী ঘাসফুল।

'এটা কী, দাদু?' অবাক লাগল ভালেন্তিংকার। 'ওই দ্যাখো, একটা ডাঁটায় নানা রঙের ফুল।'

'এটা হল আমাদের মেদুনিৎসা,' বললে দাদু, 'আর নানা রঙের ফুল কেন জানিস, যেগুলো আগে ফুটেছে সেগুলো বেগুনী, যেগুলো পরে সেগুলোর রঙ গোলাপী।'

একটু দূরে, চওড়া চওড়া ফারগাছগুলোর ছায়ায় তখনো বরফ জমে ছিল। তাহলেও ফুল ফুটেছে একেবারে বরফের কাছেই, এমন কি বরফ ফুঁড়েই বেরিয়েছে নরম সবুজ কলি।

তাইস্কা আর রমানক চলে গেল গাছ কাটা ফাঁকাটার দিকে। সেখানে গুঁড়িগুলোর আশেপাশে প্রতি বসন্তে ব্যাঙের ছাতা গজায়। ভালেন্তিংকা কিন্তু দাদুর কাছেই রয়ে গেল।

আর নানা রকম গল্প শোনালে দাদু। বনফুল হল বসন্তের প্রথম ফুল। অন্যগুলোর যখন সবে ঘুম ভাঙছে বীজের মধ্যে, এগুলো তখন কালো কালো ঝরা পাতার তলেই শিকড় নামিয়ে কুঁড়ি গজিয়ে তৈরি। বরফ একটু সরে যেতেই মাথা তুলবে পাতা ফুঁড়ে।

ভালেন্তিংকাকে দাদু দেখালে বায়ু-পরাগী ফুল—হালকা, শাদা রঙ, অরণ্যের আলো আঁধারিতে চেয়ে আছে আপন মনে। এক জায়গায় ঝরা পাতার স্তরটা সরিয়ে দিলে দাদু—দেখা দিল ফার্ণ গাছের সর্পিল মোচড় দেওয়া ফ্যাকাশে শিষ। অদ্ভুত একটা ফুল দেখালে তাকে—পেত্রভ ক্রস। প্রায় সারা বছরই সে থাকে মাটির তলায়। শুধু প্রথম বসন্তে, যখন বনটায় তখনো পাতা গজায় নি, তখন মাটির তল থেকে সে একটা আঁশ-আঁশ মোটা ডাঁটা বাড়িয়ে দেয় ওপরে, ফুটতে শুরু

করে, তারপর ফের লুকিয়ে যায় মাটির তলে। অবিশ্যি ওর ওই আঁশগুলো মোটেই ফুলের মতো দেখতে নয়, কিন্তু কী এসে যায় তাতে? যে যেমন পারে, তেমনি করেই তো ফোটে।

সবেতেই অবাক লাগল ভালেন্তিঙকার, সবই মোহিত করে দিল: লেবু রঙা যে প্রজাপতিটা উড়ে এল মেদুনিৎসা ফুলের কাছে, ফার গাছের ঝালরের শেষে সবে উঁকি দিচ্ছে যে লালচে মোচাটা, খাদের মধ্যে জলের স্রোত, গাছের ডগা থেকে ডগায় উড়ে যাওয়া পাখিগুলো...

কাটার জন্যে একটা গাছ বাছাই করে দাদু কুড়ুল চালাতে লাগল। তাইস্কা আর রমানক জোরে ডাকাডাকি করে পরস্পরকে সাড়া দিচ্ছে। ফিরে আসছে তারা। হঠাৎ ব্যাঙের ছাতার কথা মনে পড়ল ভালেন্তিঙকার। সে কী, একটা ছাতাও কি সে খুঁজে পাবে না? ইচ্ছে হল তাইস্কার কাছে ছুটে যায়। হঠাৎ খাদটার প্রান্তে নীলাভ কী যেন চোখে পড়ল তার। কাছে এগিয়ে গেল সে। হালকা সবুজের মাঝখানে অজস্র ফুটে আছে জ্বলজ্বলে নীল ফুল, ঠিক বাসন্তী আকাশের মতোই নীল, তেমনি অনাবিল। বনের আধোআঁধারে যেন আলোর মতো দপদপ করছে। উল্লাসে ভরপুর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভালেন্তিঙকা:

'তুষার ফুল!'

সত্যিকারের তুষার ফুল, জীবন্ত! অনায়াসে তুলে নেওয়া যায় ওগুলোকে। কেউ তো আর পোঁতে নি, বসায় নি। ছিড়ে নেওয়া যায় যত খুশি, পুরো এক গোছা, এক রাশ, যত আছে সব তুলে নিয়ে যাওয়া যায় বাড়িতে!

কিন্তু... সব ফুলগুলো যদি ভালেন্তিঙকা তোলে, তাহলে জায়গাটা যে হয়ে যাবে ফাঁকা, ছন্নছাড়া, অন্ধকার। না, বরং ফুটন্তই থাক! এখানে এই বনের মধ্যে ওগুলো দেখতে অনেক সুন্দর। শুধু অল্প কিছু ফুল তুলবে সে, ছোট্ট একটা তোড়ার মতো। তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।

বন থেকে ওরা যখন ফিরল, মা ততক্ষণে বাড়ি এসে গেছে। সবে মাত্র হাত মুখ ধুয়েছে সে, তোয়ালেটা তখনো হাতেই আছে।

'মা, মা,' দূর থেকেই চ্যাঁচাল তাইস্কা, 'দ্যাখো কত ব্যাঙের ছাতা তুলেছি!'

'খেতে দাও মা!' বললে রমানক।

আর ভালেন্তিঙকা তার কাছে গিয়ে এক মুঠো তাজা, নীল ফুল এগিয়ে দিলে, তখনো তা থেকে আলো ঠিকরচ্ছে, তখনো তাতে বনের গন্ধ জড়ানো।

'আর এটা আমি তোমার জন্যে এনেছি... মা।'

'রামধনু' সিরিজে প্রকাশিত:

আ. আলেক্সিন, 'ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ঘটনা'

শিশু ও কিশোরদের জন্য অনেক বইয়ের লেখক খ্যাতনামা সাহিত্যিক আনাতোলি আলেক্সিনের নতুন কাহিনী এটি। লিখিত এটি স্কুলের ছাত্র আলিক ডিটেকিনের জবানিতে—তার স্বপ্ন ছিল সে ডিটেকটিভ হবে।

বইটি সচিত্র, মুদ্রণ নয়নাভিরাম। লেখক নিজেই একটি ভূমিকা লিখেছেন।

১৯৭০ সাল থেকে 'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা' (শিশুদের জন্য লেনিন কাহিনী) এবং 'বৃষ্টি আর নক্ষত্র' নামে গল্প সংকলন দিয়ে যে 'রামধনু' সিরিজ শুরু হয়েছে, বইটি তার অন্তর্গত।

'বৃষ্টি আর নক্ষত্র' (সোভিয়েত শিশুসাহিত্যিকদের গল্প সংকলন)

মজার ঘটনায় কার না হাসি পাবে? তবে শুধুই হাসিতে তা শেষ হয় না, অন্যের ভুলচুক থেকে নিজের জন্যেও কিছু শিক্ষা মেলে বৈকি। ন. নোসভের এমনি একটা মজার গল্প 'মিশকার রান্নাবান্না' দিয়ে সংকলনটির শুরু। এতে জনপ্রিয় সোভিয়েত রুশ সাহিত্যিক ভ. ক্রাপিভিন, ভ. দ্রাগুনস্কি ছাড়াও আছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণী অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলির লেখকেরা, যেমন কুমিক ইয়াখিয়ায়েভ, আজারবাইজানী খ. হাসিলভা প্রভৃতি। কিশোর পাঠকেরা জানতে পারবে কী ভাবে থাকে, পড়াশুনা করে, ছুটি কাটায় সোভিয়েত ছেলেমেয়েরা, দুনিয়ার সব ছেলেমেয়েদের মতো তাদের জীবনেও মজাদার অ্যাডভেঞ্চার কম ঘটে না। সেই সঙ্গে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে হলে কী ভাবে চলতে হয় তেমন সব গুরুতর প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা কাহিনীরও দেখা পাবে তারা।

বইটি সুসজ্জিত ও সচিত্র।

Л. ВОРОНКОВА

ВОЛШЕБНЫЙ БЕРЕГ
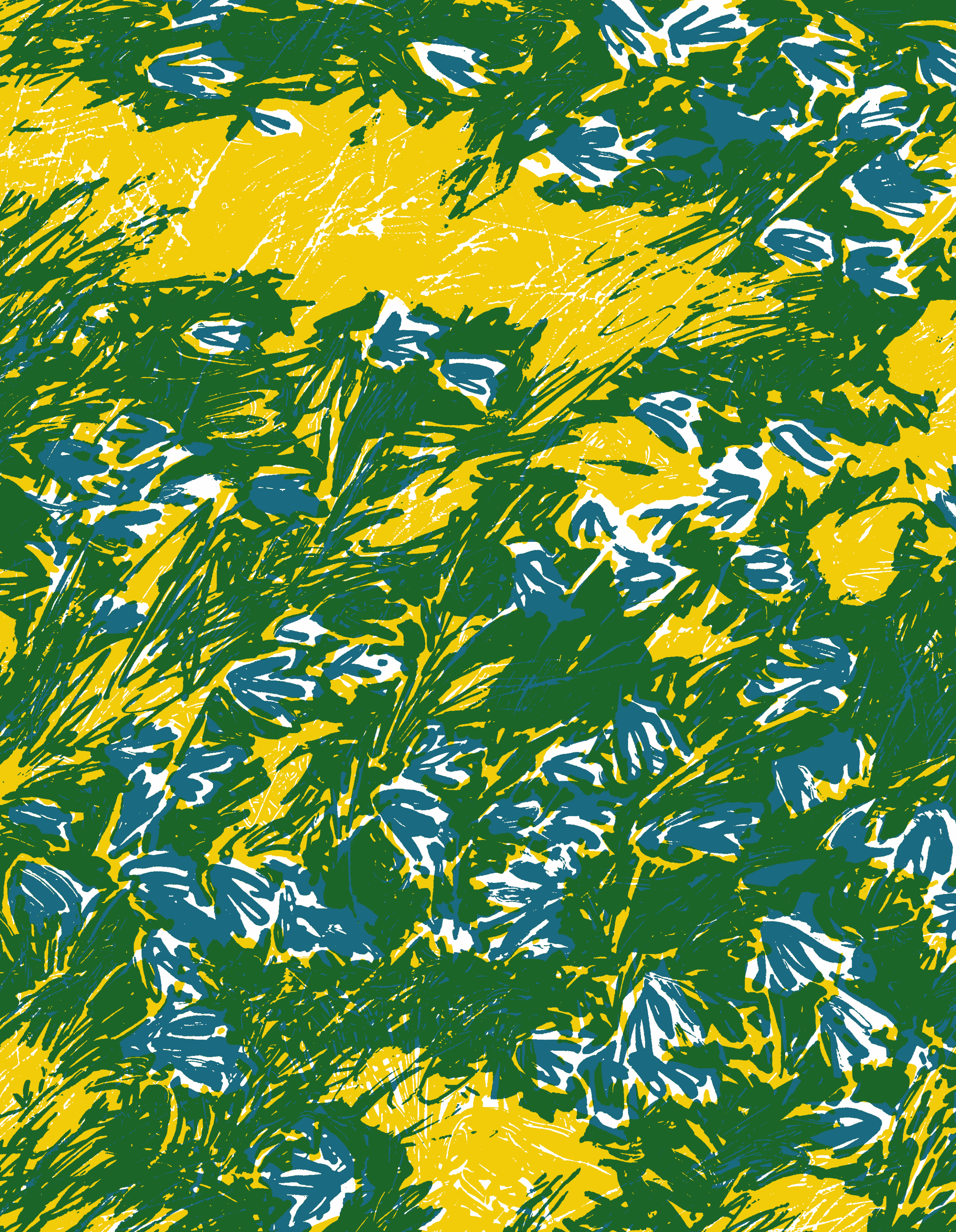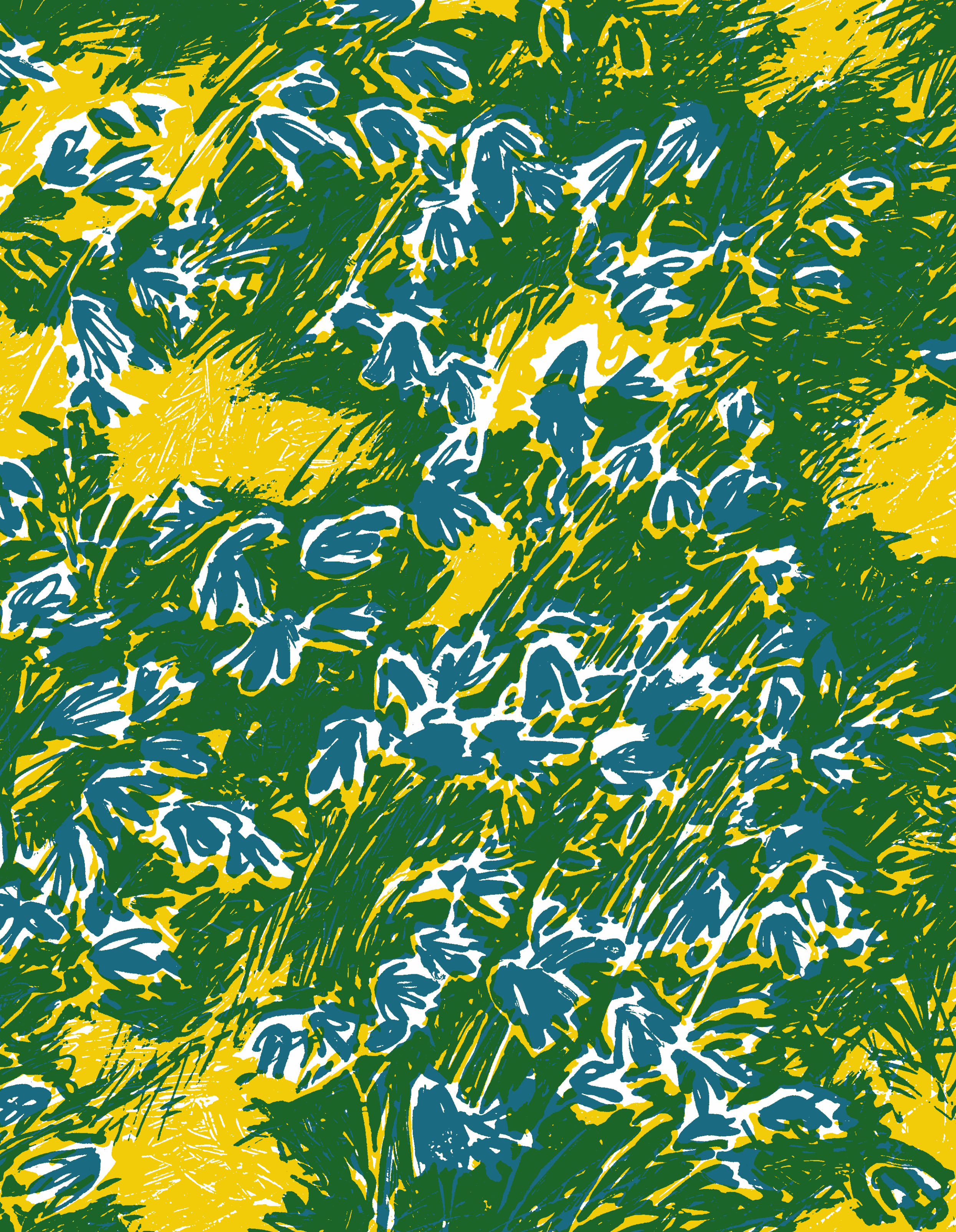
На языке бенгали